মলীচন্দন

মালাচন্দন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শেষ বিস্ময়

প্রশান্তর কাছ থেকে সহজ বা স্বাভাবিক আচরণ কেউই আশা করে না, এটা ঠিক, তবু এবার যেন মাত্রাটা একটু ছাড়িয়েই গেল। কবির ভাষায় যাকে বলে 'বিস্ময়েরে বিস্মিত করিয়া'—প্রশান্ত এবার সেই ভাবেই বিয়েটা ক'রে ফেললে।

বাপ-মা মারা গেছেন শৈশবেই কিন্তু তার জন্যে লেখাপড়া করাটা আটকাত না, কারণ নিঃসন্তান কাকা-কাকী যত্ন ক'রেই মানুষ করতে চেয়েছিলেন ওকে।

প্রথম বাড়ী থেকে পালায় প্রশান্ত দশ বছর বয়সে, মাসখানেক পরে ঘুরে এসে আবার ও বইখাতা নিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু বারো বছরে পালিয়ে বছর খানেক পরে যখন ফিবে এল তখন আর কিছুতেই ও-কাজে তাকে রাজী করা গেল না। সে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতেই হাত-পা নেড়ে বললে, 'আবার? মাপ করো কাকী, সরস্বতীর সঙ্গে এইখানেই আমার সম্পর্ক শেষ।'

নাটকীয় হতেই পারে ভাবভঙ্গী। কারণ এবার বাড়ী থেকে পালিয়ে ও গিয়েছিল বোম্বাই—বিনা টিকিটে। সেখানে এক রেস্তোরাঁতে কাপ-ডিস ধোয়া চাকরী পেয়ে মাস-তিনেক টিকে ছিল। তারপর বোম্বাই যখন পুরোনো হয়ে গেল তখন এক ভ্রাম্যমাণ পার্শী থিয়েটারের দলে ঢুকে প'ড়ে বাকী আট-ন' মাসে ভারতের প্রায় দশ-বারোটি বড় বড় শহর ঘুরে

বেড়িয়েছে। সেখানে কাজ করতে হ'ত অনেক, শহরের দেওয়ালে যারা পোষ্টার মারে তাদের 'লেই'এর বালতি এবং কাগজের গোছা বওয়া, সকালে-বিকেলে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলোনো, ফিরে এসে চা তৈরী করা, দরকার হ'লে রান্না করা—এবং মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ—এগুলো হ'ল মোটামুটি কর্ত্তব্যের মধ্যে। এ ছাড়াও কিছু কিছু ছিল বৈ কি!

কাকী প্রশ্ন করতেন, 'ফিরে এলি যে বড় ?'

'কোম্পানীই যে অক্কা হয়ে গেল। অবিশ্যি আমাকে একজন দিল্লীতে চাকরী দিতে চেয়েছিল কিন্তু বামুনের ছেলে, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে চাকরের কাজ করব ? ছো···ওটা যা করেছিলুম দেশ বেড়াবার জন্যে। তা দেখেছি খুব, জানো কাকী, দিল্লীতে বরফের মধ্যে গর্ত্ত ক'রে আঙ্গুরের থোলো রেখে দ্যায়, আর ঠেলাগাড়ী ক'রে সেই আঙ্গুর বেচে—ছে-ছে আনা পাও। মানে দেড় টাকা সের। কী মজা!···আবার রাজকোটে'—ইত্যাদি!

বছর পনেরো-ষোল যখন বয়স তখন কাকা একদিন বললেন, 'কিছুই ত শিখলিনে, তা বরং আমার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারীটা শিখে নে। যেমন তেমন ক'রে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার করতে পারবি।'

চট্ ক'রে জবাব দেয় প্রশান্ত, 'তা আর জানি না! ভাল ডাক্তারখানায় ঢুকতে পারলে মাসে তিন-চারশ টাকাও হতে পারে। এ আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। দামী ইঞ্জেকশ্যন্ রোজ দু-একটা সরাতে পারলেই ত লাল!'

কাকা দমে গেলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা সে হাতটা

আর আমাকে দিয়ে পাকিও না বাবা! তাহ'লে বরং এটা থাক্।'

'ক্ষেপেছ মেজকাকা, তোমার এই পাড়াগাঁয়ের একরত্তি ডাক্তারখানা, কী আছে যে, ঝাড়ব? না—আমি সে আখেরের কথা বলছিলুম!'

মাস তিনেক কাজ শেখার পর একদিন মেজকাকাকে এসে বললে, 'কাকা, এবার আমার মাইনেটা তাহ'লে যা হোক ঠিক ক'রে দাও!'

কাকা ত অবাক!

'মাইনে?'

'ওমা—মাইনে দিতে হবে না? প্রথম দু'মাস না হয় আনাড়ি ছিলুম, এখন ত দস্তুরমত খাটছি। না হয় বুড়ো শিব বাবুকে তাড়াও, সব কাজ আমি করতে রাজি আছি। মাইনে না পেলে আমার চলবে কিসে? বড় হয়েছি, হাতখরচা ত আছে? নেশা-ভাঙ করতে শিখব ক্রমশ, খরচ আছে বৈ কি!'

'আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। নিস্ আসছে মাসে দশটা টাকা।'

প্রশান্ত তখন আর কিছু বললে না। এর মাস-খানেক পরে যখন পালাল তখন দেখা গেল যে, এই এক মাসেই ও স্থানীয় ডাকঘরে একশ' সাত টাকা জমিয়েছিল, তার মধ্যে একশ' টাকা নিয়ে হাওয়া হয়েছে। টাকাটা কিসে এল তাও জানতে বেশি দেরী লাগল না—মাথাধরার ওষুধ আর পেটখারাপের সাল্‌ফা ওষুধ একেবারে হাজার দরে কেনা থাকত—তার বোতল খালি হয়ে গেছে।

এর জন্য যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, প্রশান্ত অপ্রতিভ হবে তাহ'লে সেটা তাঁরই ভুল। মাস-দেড়েক পরে বেশ হাসিমুখেই বাড়ী ঢুকল প্রশান্ত,

তেমনি দাপট তেমনি হাঁকডাক। কিন্তু ক'দিন পরেই একটু গম্ভীর হতে হ'ল, কারণ দেখা গেল অনাথ ভাইপোকে বাড়ী ঢোকা বন্ধ করতে না পারলেও ডাক্তারবাবু তাঁর ডিস্‌পেনসারীতে আর ঢুকতে দিতে রাজী নন। সেদিকে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রশান্ত বেগতিক দেখে কাকীকে গিয়ে একদিন বললে, 'বা রে, তাহ'লে আমার চলবে কিসে? এর মধ্যে আবার সিগারেট ধরেছি, সিনেমা-ফিনেমা আছে—'

'ডাক্তারখানাটা বাদ দাও না বাবা। পৈত্রিক জমিজমাগুলো পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খাচ্ছে সেগুলো দেখাশুনো করলে ত তবু দুপয়সা আসে।'

'হ্যা—আমি এই হেঁটোর ওপর কাপড় তুলে মাঠে-মাঠে আলে-আলে ঘুরে বেড়াই। আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ত!...না, ওসব আমি পারব না। বরং কাকাকে একটা চাকরী-বাকরী দেখে দিতে বলো—'

'কী চাকরী করবি তুই? কী শিখেছিস যে কাজ করবি?'

'আর কিছু না হোক কারখানায় ত লোহা পিটতেও পারব? হাতের গুল্লিটা দেখেছ?'

এই ব'লে সে নিজের বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশিগুলো একবার প্রসারিত করে। এদিক দিয়ে সত্যিই সে ভাগ্যবান—কোন রকম চেষ্টা-যত্ন না ক'রেই ওর দেহটা যা গড়ে উঠেছে তা দেখবার মত।

কাকা ওর প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, ওকে আমি মাসে দশটা ক'রে টাকা হাতখরচ দেব এখন—ওকে বলো দয়া ক'রে আর কিছু করতে হবে না। বাজার-হাটগুলো ক'রে দিলেই ঢের। আমি একা মানুষ, পেরে উঠছি না—'

প্রশান্ত বললে, 'তা মন্দ নয়—হাট-বাজার দোকানদানী থেকেও কোন্ না রোজ গেলে চার গণ্ডা পয়সা আসবে। তাই হোক—'

কাকী অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেন, 'অবাক্ করলি যে তুই, বাড়ীর বাজার থেকে পয়সা চুরি করবি?'

'কেন করব না? অপরকে দিলে সে করত না? পর না পেয়ে ঘরের লোক পেলে বুঝি বুক টাটায়?'

কাকা শুনে বললেন, 'যাক গে। ওতেই যদি খুশি থাকে ত থাক।'

প্রশান্তও বললে, 'পাড়ায় থিয়েটার ক্লাবটা ত প্রায় উঠে যেতেই বসেছে, দেখি যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি।'

বছর দুই-তিন এই ভাবেই কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন সে বললে, 'না, কাকা, এবার আর ত চাকরী-বাকরী না করলে চলছে না! একটা ত খুঁজে নিতে হয় কিছু।'

'কেন রে, কি হ'ল?'

'বড় হয়েছি। বেকার থাকলে কি চলে? আখেরের চিন্তা নেই?'

বার-কতক বললে কাকাকে। কাকা সেই একই উত্তর দেন, 'আমি পাড়াগাঁয়ে ব'সে কী দেখি বল দিকি তোর জন্যে?'

'তবে কিছু টাকা দিন—শহরে গিয়ে চেষ্টা করি।'

'হ্যাঁ, তোমার হাতে টাকা দেবে! বলে একমাত্র পোকে ডাইনের হাতে সমর্পণ! দুদিনে ফুর্তি ক'রে সব উড়িয়ে দিয়ে দাঁত বার ক'রে এসে দাঁড়াবে। তোমাকে আমি চিনি না!'

প্রশান্ত উত্তর দিলে না। সে কথার লোক নয়—কাজের লোক। দিন-

দশেক পরে কাকার পকেট থেকে প্রায় সত্তরটা টাকা নিয়ে পুনশ্চ উধাও হ'ল।

মাস-খানেক পরে হাজারীবাগ থেকে এক চিঠি এল—'আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখানে এক কারখানায় কাজ পাইয়াছি—দেড় টাকা রোজ, রবিবার বাদ। তা মন্দ কি এ বাজারে?'

বছর-খানেক কাজ করলে সেখানেই। কাকাকে কিছু টাকাও পাঠিয়েছিল মধ্যে—কাকীকে লোক মারফৎ দু'খানা ছাপা শাড়ী। তারপরই হঠাৎ একদিন আবার এসে হাজির, 'চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম মেজকাকা, ও আর পোষাল না।'

'কেন রে, কী হয়েছিল?'

'যা হয়। অসৎসঙ্গ ত—এধারে কাজ দেখে বাবুরা খুশি হয়ে ন'সিকে রোজ ক'রে দিলেন—কাঁচা পয়সা হাতে পড়তে লাগল। শনিবারে শনিবারে বেশ মদ আর জুয়োর চকড়বা বসতে শুরু হ'ল! বেগতিক দেখে পালিয়ে এলুম। শেষকালে কি মদের নেশা ধ'রে যাবে? তাহ'লেই ত সর্ব্বনাশ! তা ছাড়া ব্যাপারগতিক যা দাঁড়িয়েছিল—মেয়েমানুষও হয়ত জুট্‌ত এসে। না—না—ও কোন কাজের কথা নয়। নইলে চাকরী ত ভালই ছিল—যুদ্ধের বাজার, চড়-চড় ক'রে উন্নতি হ'ত এখন!'

কাকা কথা কইলেন না—কথা কওয়া ছেড়েই দিয়েছেন বহুকাল।

কিন্তু দিন-কতক পরে তিনি সত্যি-সত্যিই বিস্মিত হলেন যখন উপযুক্ত ভাইপো এসে বললে, 'কাকা, জমিজমাগুলো এবার আমাকে আলাদা ক'রে দিলে হ'ত না?'

'সে কি?'

'কেন, এতে অবাক্ হবার কি আছে? পৈত্রিক জমি, আমার হিস্‌সে ত একটা আছেই।'

'তা ত আছে। কিন্তু আমরা মলে সবই ত তোমার বাবা!'

'সে এখন ঢের দেরী। মানুষের পরমায়ু কিছু কি বলা যায়? তা ছাড়া তুমি গেলেও কাকী থাকবে। সে কাকে কি দিয়ে যায়—আর অত দিন আমার চলবে কিসে?'

কৌতূহলী কাকী প্রশ্ন করে, 'জমিজমা নিয়েই বা করবি কি, চাষ ত করতে চাস না!'

'রামচন্দ্র! চাষ করব কে বললে! ভাগ হয়ে গেলেই জমি বেচে দেব। আমাকে ত যা হোক একটা কিছু করতে হবে। কাকা ত মূলধন দেবে না, ব্যবসা-পত্তর করি কি দিয়ে?'

'তা ব'লে জমিজায়গাগুলো সব খোয়াবি? এর পর যে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।'

'শুভ কাজের গোড়াতেই অমন ক'রে টুকো না কাকী—ভাল হবে না বল্‌ছি। খোয়াব কেন? যুদ্ধের বাজার, ব্যবসাতে যে যা করছে—সোনা ফলে যাচ্ছে।...আমি মনে করছি ছোটখাট একটা কারখানা খুলে লোহার লণ্ঠন তৈরী করব। এ কাজ আমি নিজে করেছি ওখানে, হাড়হদ্দ সব জানি।'

কাকা পাড়ার মাতব্বরদের ডেকে জমি ভাগ করালেন। তারপর বললেন, 'তা বেচ্‌তে হয় ত আমাকেই বেচে দে। পরকে দিবি কেন?'

'জরুর। আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে সালিশরাই দাম ঠিক ক'রে দিক্। ঢের খেয়েছি তোমার—তুমি যদি দুপয়সা কমও দাও ত আপত্তি নেই।'

একটি বৃদ্ধ টিপ্পনি কাটলেন, 'ছোকরার ধম্মজ্ঞান কিন্তু খাসা!'

যুদ্ধের বাজার তখন, জমির দাম চড়েছে। প্রবীণরা হিসেব ক'রে বললেন, 'বাড়ী আর জমি মিলিয়ে আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত পেতে পারে ও!'

আড়াই হাজার!

প্রশান্তর চোখ জ্বলে উঠল। এ যে ঢের টাকা!

'ব্যবসা এখন থাক।' প্রশান্ত তার বন্ধু জগবন্ধুকে বললে, 'আপাতত কিছুদিন বোম্বে ঘুরে আসি।'

'বোম্বে? হঠাৎ?'

'ছাখ, সেবার যখন বাড়ী থেকে পালিয়ে বোম্বে গিয়েছিলুম তখন তাজমহল হোটেলের দিকে তাকিয়ে থাকতুম আর নিশ্বেস পড়ত। শুনেছি অমন হোটেল আর কোথাও নেই এদেশে—রাজা-মহারাজারা এসে ওখানে থাকে। তখন থেকেই সখ একবার ওখানে গিয়ে উঠব। মানে হাজার খানেক টাকা বাজে খরচ করব আর কি। শুনেছি কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজ নেয় ওখানে—'

'কুড়ি-পঁচিশ?' জগবন্ধুর চোখ কপালে ওঠে।

'সেটা কি খুব বেশি হ'ল? তাচ্ছিল্যর স্বর প্রশান্তর কণ্ঠে, 'তোরা ত এ গ্রাম ছেড়ে নড়লি না কোথাও, ছুনিয়ার হাল-চাল কি বুঝবি?···হ্যাঁ—ঐ যা বলছিলুম, পঁচিশ টাকা রোজ হ'লেও কুড়ি দিনে পাঁচশ' টাকা মোটে— তা ছাড়া যাওয়া-আসা গাড়ীভাড়া আছে, নিদেন যাবার সময়টাত সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে হবে, আসবার সময় না হয় ইণ্টারেই হ'ল, থার্ড ক্লাসেও আপত্তি নেই।···তারপর ভাল কাপড়-জামা কিছু করাতে হবে, ছু-একটা স্যুট

নইলে ওখানে মানাবে না। ভাগ্যিস্ গরম কাল, নইলে শীতের পোষাক করাতে গেলেই ত ফতুর।…তাছাড়া মোটামুটি বখশীষ—ট্যাক্সীভাড়া, পাঁচশ' টাকায় কুলোলে হয়! অবিশ্যি হাজারের বেশি আমি খরচ করব না—না হয় দু-একদিন কমই থাক্‌ব। তবে কি জানিস্, বড় বড় লোক ত ওখানে থাকে, তেমন-তেমন কারুর নজরে পড়ে গেলে ত আখের গুছিয়েই নিলুম, বুঝলি না? মুখটা যে আমার তত সাকারা নয়—নইলে ফিল্ম লাইনে ওখানে বিস্তর পয়সা। চেহারা ত এদিকে ভালই, দেখি সেদিকেও ট্রাই নেব একবার!'

প্রশান্ত জগবন্ধুকে কলকাতা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এল। বললে, 'তুই আমাকে বোম্বে মেলে তুলে দিয়েও সাতটার গাড়ী পাবি। রাত নটায় বাড়ী পৌঁছবি, ভয় কি অত?' রঙ্গীন সিল্কের লুঙ্গির ওপর আদ্দির পাঞ্জাবী প'রে পাইপ ধরিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে পাতা বিছানাটার ওপর যখন প্রশান্ত জাঁকিয়ে বসল তখন জগবন্ধুকে মনে মনে মানতেই হ'ল যে, বাবুয়ানি করতে জানে বটে শান্ত, দিব্যি মানিয়েছে!

৩

বোম্বেতে কুড়ি দিন শুধু নয়—এদিকে-ওদিকে আরও মাস খানেক কাটিয়ে প্রশান্ত যখন কল্‌কাতাতে ফিরল তখন তার আড়াই হাজারের আর বিশেষ কিছু নেই। তবে সুবিধের মধ্যে কলকাতাতে পা দিয়েই শুনলে দিন-তিনেক হ'ল মেজকাকা মারা গেছেন। তখনই গঙ্গায় গিয়ে চান ক'রে কাছা গলায় দিয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ীতে পা দিয়েই বললে, 'নাগপুরে যে মেজ-কাকা স্বপ্ন দিলেন—বললেন, তোকেই ছেলের মত মানুষ করেছি, কাছে ত রইলি না, এখন গিয়ে শ্রাদ্ধটা অন্তত কর।'

সকলেই বিশ্বাস করলে কথাটা। সত্যিই ত, নইলে নাগপুরে ব'সে খবর পাবেই বা কি ক'রে? আর ছেলের মত মানুষ করার কথাটাও ঠিক। স্ত্রী মুখাগ্নি দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে নুড়ো নিয়ে প্রশান্ত শ্রাদ্ধ করলে। কান্নাকাটিও করলে প্রচুর।

তারপর পনেরো দিন কোন পক্ষেই কোন কথা উঠল না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশান্ত বাড়ীতে আছে আর খাচ্ছে। এরই মধ্যে সহসা একদিন এসে বললে, 'না, মেজকাকার স্বভাবটা আর বদলালো না দেখছি!'

সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তা নইলে আমার কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে গেলেন!'

'সে কি রে?' অন্নদা পিসী সভয়ে ন'খুড়ীর কোল ঘেঁষে বসেন।

'আর কি, ঐ গাঙ্গুলী-বাগানটার মধ্যে দিয়ে এখন আসছি, দেখি সামনে মেজকাকা, পুকুরের বাঁধানো চাতাল থেকে উঠে এসে বললেন, শান্ত, বিড়ি আছে রে একটা, দেখি—!'

সকলের মুখে-চোখেই একটা অবিশ্বাস ফুটে উঠল, প্রশান্ত হঠাৎ উবু হয়ে ব'সে প'ড়ে কাকীকে ছোঁবার মত ভঙ্গী ক'রে বললে, 'মাইরি কাকী, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। মরা মানুষকে নিয়ে মিছে কথা বলব!'

কাকী জানতেন যে ইদানীং ডাক্তারবাবু চাঁদনী রাত হ'লে যাওয়া-আসার পথে সাইকেল থেকে নেমে নির্জ্জন গাঙ্গুলী-বাগানের ঐ বাঁধানো চত্তরে ব'সে থাকতেন খানিকটা ক'রে। কিন্তু সেটা ত প্রশান্তর জানবার কথা নয়! তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দানে তোরা সব জিনিষই দিলি

বাবা, গোটা কতক বিড়ি যদি দিতিস্। কাল বরং কোন বামুনকে ডেকে—'

এর দিন কতক পরেই পাড়ার দীনু চাটুয্যের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ করতে এল। মেয়ের বিয়ে। প্রশান্ত জিভ কেটে বললে, 'আমার যে কালাশৌচ এক বছর। নাই বা হ'ল নিজের বাপ, মানুষ ত করেছে। তা ছাড়া যখন শ্রাদ্ধ করেছি আমিই। তবে যাবো এ কথা ঠিক। কিন্তু খেতে বলবেন না কিছু !'

প্রশান্ত যখন পৌঁছল তখন এক পংক্তি লোক খেতে বসেছে বাইরের বড় দালানটায়। হাসিহাসি মুখে সে পেছন দিকে এসে কতকটা তদ্বির করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েই হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, 'মেজকাকা !'

সকলে চমকে উঠল একেবারে।

'কী কী শান্ত, ব্যাপার কি ?'

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না ? ঐ যে অমর কাকার ঠিক পিছনে বসে !···ঐ যে উঠে চ'লে যাচ্ছেন।'

'কে যাচ্ছেন শান্ত, কার কথা বলছ ?'

'আবার কে, মেজকাকা ! খেতে-দেতে বড্ড ভালবাসতেন ত !'

যে বিশ্বাস করে না তারও মুখ শুকিয়ে উঠল, কারণ অমর বাবু ডাক্তারের সব চেয়ে প্রিয়বন্ধু ছিলেন, আর ভোজনপ্রিয়তার কথাটাও ঠিক !

সবাই উপদেশ দিলেন, 'গয়া করাও।'

এর দিন-কতক পরেই আর এক সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে প্রশান্ত হঠাৎ কাকীকে ডেকে প্রশ্ন করলে, 'মেজকাকী, তুমি নাকি ডাক্তারখানাটা চালাবার মতলবে আছ ?'

চমকে উঠলেন মেজকাকী, 'কে বললে রে তোকে ?"

কাউকেই ত বলেননি তিনি—শুধু ভাবছেন কথাটা ক'দিন থেকেই।

'আবার কে বলবে, মালিক স্বয়ং। আজ আবার সেই গাঙ্গুলী-বাগানের পথে দেখা। বললেন, তোর মেজকাকী মতলব করছে যে তোকে দিয়ে ডাক্তারখানাটা চালাবে, কোন নতুন ডাক্তার বসিয়ে। সে সব দুর্ব্বুদ্ধি না করে। তোকে ত চিনি, তুই যথাসর্ব্বস্ব দুদিনে উড়িয়ে দিবি—নয়ত কোথাও সরে পড়বি। তার চেয়ে যা পায় বিক্রী ক'রে দিয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে পুরে ফেলতে বল।···তা আমি বললুম তুমি নিজে বললেই হ'ত—তার জবাবে বললে, আমি এখন সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোর মেজকাকী ভয় পেয়ে যাবে—চেঁচামেচি কান্নাকাটি করবে, হয়ত একটা ব্যামো দাঁড়িয়ে যাবে ভারী রকম! তুই-ই বলগে যা—তাতেই হবে।'

কথাটা মেজকাকীর বিশ্বাস হ'ল। প্রথমত, এ মতলবের কথা সত্যিই কাউকে তিনি বলেননি, তা ছাড়া প্রশান্ত কিছু আর নিজের গুণ নিজে অমন ক'রে ঢাক পিটতে পারে না, তার সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওর মেজকাকা সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—কিন্তু সেটাও তাঁরই কথা নিশ্চয়!

মেজকাকী যেন খুব একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন এই ভাবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাগ্রহে বললেন, 'তবে বাবা, একটা খদ্দের ছাখ।'

খদ্দের দেখা হ'ল। প্রশান্তর মারফৎই দেখাশুনা দরদস্তর চলল—অবশেষে এক নতুন-পাস-করা ডাক্তার তেরশ' টাকা মূল্যে সমস্ত ডিস্‌পেনসারী মায় সাজপাট্ সমেত কিনে নিলেন। সেই টাকাটি যেদিন পাবার কথা প্রশান্ত

কাকীকে বলেছিল, তার আগের দিনই বুঝে নিয়ে বোধ করি পঞ্চমবারের বার আবার ডুব মারলে।

এর পর বছর-দুই কোন খবরই ছিল না আর। তারপর একেবারে এই বিয়ে।

একটি চিঠি এল মেজকাকীর নামে, 'আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই। তবে এই একটা কথা—টাকাটা অপব্যয় করি নাই, ব্যবসায় করিয়া এক রকম দাঁড়াইয়াছি। আরও উন্নতি হইত, যুদ্ধটা ফস্ করিয়া থামিয়া গেল, তাই। সে যাহা হউক শ্রীচরণে এক্ষণে নিবেদন এই যে আমি আর একটি দুষ্কার্য্য করিয়াছি। আমি বিবাহ করিয়া বসিয়াছি। মেয়েটি বৈদ্যের, খুব সুশ্রী এবং গুণবতী। যদি অভয় দেন ত বধূকে সঙ্গে করিয়া প্রণাম করিতে যাই।'

যাই করুক না কেন ও—ছেলের মত মানুষ করেছিলেন এটা ঠিক। অজাতে বিয়ে করেছে, তা অমন ত আজকাল হামেশাই হচ্ছে। তা ছাড়া বৈদ্য এমন কিছু খারাপ না—মেজকাকী চিঠি লিখলেন, 'তুমি যখন বিবাহ করিয়াছ তখন তিনি আমার পুত্রবধূ। অবশ্য লইয়া আসিও।'

দিন-তিনেক পরেই প্রশান্ত বৌ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। বেশ সুশ্রী মেয়েটি, কিছু কিছু লেখাপড়াও জানে ব'লে মনে হ'ল। দু-চারখানা গহনাও ওর বাবা দিয়েছেন। নিভৃতে এক সময় বৌকে কাছে বসিয়ে মেজকাকী সস্নেহে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা ত এখনও আছেন শুনছি। তা তিনি যে বিয়ে দিলেন ও কী রোজগারপাতি করে, কোথায় কি আছে-টাছে, কিছু খোঁজ করেছিলেন?'

'উনি বাবাকে বলেছিলেন যে পাতিপুকুরের কাছে কোথায় ওঁর একটা লোহার কারখানা আছে। হঠাৎ পথে আলাপ। কথাবার্ত্তায় ওঁকে ভারি পছন্দ হয় বাবার—একেবারে বাড়ীতে ডেকে আনলেন। তারপর কী চোখে যে দেখলেন বাবা, কোন খোঁজ-খবরই করেননি। বিয়ে, বৌভাত, ফুলশয্যা পর্য্যন্ত ত আমাদের বাড়ীতে থেকেই হ'ল—উনি বললেন, অজাতে বিয়ে করেছি আত্মীয়-স্বজন ত কেউ আসবে না। আমি কারখানারই একদিকে থাকি, সেখানে বৌ নিয়ে গিয়ে তুলব কোথায় ?

'সে কারখানা তারপর কেউ দেখেছে ?'

আরও মাথা নীচু ক'রে বৌ উত্তর দিলে, 'বিয়ের পর ত একদিনও কোথাও যাননি। কেউ আসেওনি ওঁর কাছে। তাইতেই সন্দেহ হয় যে—। দাদা একদিন ঠিকানাটা চেয়েছিলেন তাও পাননি। বাবা খুব কান্নাকাটি করছেন ক'দিন, দাদা রাগারাগি করছেন—তাই ত এখানে চলে এলেন।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেজকাকী বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছি মা, নইলে এখানে আর ও আসত না !'

পরের দিন প্রশান্ত হঠাৎ প্রস্তাব ক'রে বসল, 'এখানে ত তাহ'লে একটা ভোজটোজ দিতে হয়—এতদিন পরে যখন বিয়ে করলুমই। ছেলেরাও ধরেছে খুব।'

কাকী একটু কঠোর কণ্ঠেই বললেন, 'টাকাটা কোথা থেকে আসবে শুনি ?···তোর লজ্জা করে না ওসব কথা মুখে আনতে ? চিরকাল ধাপ্পা আর জুচ্চুরির ওপর চললি—তা সে আমাদের সঙ্গে যা করেছিস করেছিস, আবার একটা ভদ্দরলোকের মেয়েকে এর সঙ্গে জড়িয়ে সর্ব্বনাশ করলি কেন তার ?'

'বা রে! তুমি কি ভাবছ আমার সব ধাপ্পা। আমার ব্যবসা-পত্তর কিছু নেই?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই ভাবছি। এই পষ্ট ক'রেই ব'লে দিলুম!'

খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে 'হুঁ' ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল শান্ত।

এর দিন-দুই পরে ভোরবেলা উঠে রেবার দিকে চেয়ে মেজকাকী অবাক্ হয়ে গেলেন। গায়ে গহনা বলতে শুধু দু'গাছি বালা আর তিনি যে সোনা-বাঁধানো লোহা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন তাই—আর কোথাও কিছু নেই।

'বৌমা, তোমার গয়না সব কি হ'ল? চুড়ী, হার, আর্মলেট?'

রেবার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হয়ে উঠল, 'সে কি, আপনার কাছে দেন্‌নি সব? তবে যে কাল বললেন, চারদিকে চোরের ভয় ব'লে আপনিই বলেছেন খুলে দিতে—সিন্দুকে তুলে রাখবেন! তখন ত রাত ন'টা, হাতে ক'রে আপনার ঘরের দিকেই ত গেলেন—আবার ত তখনই ফিরলেন—'

'ত্যাখো ত্যাখো, গেল কোথায়! ঘরে আছে?'

'না ত। আজ খুব ভোরেই উঠেছেন।'

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না প্রশান্তকে। তখনই স্টেশনে লোক পাঠানো হ'ল, গুটকে বড় জংশনে সাইকেল ক'রে গেল—কোথাও না। যেন এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে উবে গেল পৃথিবী থেকে!

মেজকাকী হায় হায় করলেন খানিকটা। গালাগালি অভিসম্পাত অনেক কিছু দিলেন উদ্দেশে। কিন্তু রেবা স্থির হয়ে ব'সে রইল। সন্ধ্যার দিকে কাকীর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আপনি ভাববেন না মা, আমাকে অত সহজে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে—এমন মেয়ে আমি নই। তার খোঁজ আমি বার করবই।'

রেবা সাত-আটখানা চিঠি লিখলে। বাক্স খুলে যৌতুকের ক'টা টাকা বার ক'রে গুট্‌কে আর জগবন্ধুর হাতে দিয়ে কতকগুলো জায়গায় খোঁজ-খবর নিতে ব'লে দিলে। অসতর্ক মুহূর্ত্তে কতকগুলি লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা ব'লে ফেলেছিল প্রশান্ত—রেবা তা ভোলেনি।

মাস-খানেক ওয়াল্‌টেয়ারে একটা নামী বিলিতী হোটেলে কাটিয়ে প্রশান্ত সোদপুরে এক বন্ধুর বাসায় এসে উঠল প্রায় এক বস্ত্রে।

'যা হয় একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দাও ভাই নির্ম্মল, নইলে তোমারই ঘাড় ভেঙ্গে খাবো।'

'তুমি কি পারবে কারখানায় কাজ করতে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সে।

'খুব পারব। এর আগে ত করেছি দেখেছ, নইলে তোমার সঙ্গে আলাপটা হ'ল কিসে?'

'তুমি না বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ—সখ ছিল, দিন-কতক মিটিয়ে নেওয়া গেল আর কি!'

'দিন কতক মিটিয়ে নেওয়া গেল!···তারপর? সে'বৌ কোথায়?'

'কাকীর ঘাড়ে ফেলে রেখে এসেছি। তারও ত ছেলেপুলে নেই। হাতে দু'পয়সা আছে। না, তাড়িয়ে দেবে না সে।'

নির্ম্মল কাজ জোগাড় ক'রে দিলে একটা ওরই কারখানায়—সবসুদ্ধ মাসে পঁয়ষট্টি টাকা পাবে। একটা ঘরও খুঁজে দিলে কাছাকাছি।

একদিন শনিবার ওভারটাইম ক'রে সন্ধ্যের আগে বাসায় ফিরে প্রশান্ত রান্নার জোগাড় করছে, একটি সাইকেল-রিক্সা এসে থামল ওর দোরগোড়ায়।

নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করে এসেছে কেউ—তবু কৌতূহলী হয়ে শান্ত উঁকি মেরে দেখলে প্রশান্তমুখে রেবা নামছে রিক্সা থেকে। সঙ্গে একটি ছোট পুঁটুলি—

'এ কি, তুমি?'

'হ্যাঁ। তুমি ওয়াল্‌টেয়ার থেকে ফিরে এখানে কাজ নিয়েছ শুনেছি, শুধু বাসাটা পাওনি ব'লে অপেক্ষা করছিলুম। বাসাও যখন পেয়ে গেলে তখন আর দেরি ক'রে লাভ কি?'

'তা—তার মানে?'

'মানে বাবা-কাকীকে যত সহজে ভাঁওতা দেওয়া যায় আর ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, স্ত্রীকে তত সহজে ঠিক্ যায় না। এই মানে, আর কি!'

'তুমি—তুমি এখানে থাকবে নাকি?'

'ওমা, তা থাকব না? স্বামীর আশ্রয় ছাড়া স্ত্রীর গতি কি? আমাকে আর তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোথাও পালাতে পারবে না—এইটে যত শীগ্‌গির বুঝতে পারো ততই ভাল। মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করো। আর ওসব হঠাৎ-নবাবীর মধ্যে যেও না।'

'এখানে এইটুকু একখানা ঘরে থাকবে কোথায়?—এসব মতলব দিলে কে?'

'মতলব দেয় প্রয়োজনে। আর দু'টি ত প্রাণী। না কুলোবার আছে কি? কী রাঁধছ, সরো আমি দেখছি—'

প্রশান্ত অবাক হয়ে তাকিয়েই রইল ওর মুখের দিকে। এতদিন সে অপরকে বিস্মিত ক'রে এসেছে, এবার ওর নিজেরই বিস্মিত হবার পালা!

গৃহিণী

ব্যাপারটা সামান্যই, কারুর টের পাবার কথাও নয়। যে লোকটি দীর্ঘকাল শুধু নীচে বাইরের দিকের কোণের ঘরে নিঃশব্দে ব'সে তামাক খেয়ে কাটিয়ে দিলেন, যাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেত শুধু একদিন—প্রতি মাসের তিন তারিখে, যেদিন তিনি পেন্‌সন্‌ আনতে যেতেন—অবশ্য কখনও কখনও মাসের শেষের দিকে যখন মনোরমার হাতের টাকা ফুরিয়ে আসত তখন কোন অজানা সঞ্চয় থেকে টাকা বার ক'রে দিতে হ'ত তাঁকে—সে সময়ও, সেই লোকটি যদি তেমনি নিঃশব্দে ভাত খেয়ে উঠে তামাক টানতে টানতে মারা যান ত এমন একটা কিছু সাড়া পড়বে চারিদিকে, এটা আশা করা উচিত নয়। মহেশবাবু যেমন নিভৃতে নিঃশব্দে বাস করতেন তেমনিই একদা সকলের অজ্ঞাতে স'রে পড়লেন—কারুর সেবা নিলেন না, কাউকে হা-হুতাশ করতে দিলেন না, ডাক্তার ডাকারও অবসর হ'ল না।

মনোরমাও বিশেষ বিচলিত হ'লেন না, হবার উপায়ও ছিল না। বিরাট সংসার, বড় দুই ছেলে বিবাহিত, তাদেরও চার পাঁচটি ক'রে ছেলে মেয়ে, এ ছাড়া চারটি মেয়ে বিবাহিতা, তাদের মধ্যে জন-দুই ক'রে ক্রমান্বয়ে মায়ের কাছে থাকতই—সেও কতগুলি নাতি নাত্‌নি। এ ছাড়া ছোট ছেলে বাপি এখনও কলেজে পড়ছে, তার ঝঞ্ঝাট কম নয়। এক কথায় তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবারই সময় নেই, এর ভেতর স্বামীর জন্য শোক

করার ফুরসৎ কৈ? আর সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। মহেশবাবু পেন্‌সন্‌ নেওয়ার পর থেকেই প্রায় ঐ কোণের ঘরটি আশ্রয় করেছিলেন, ঐখানেই সকালে তাঁর কাগজ আর চা আসত; দু-একজন বন্ধুবান্ধবও জুটত আগে আগে, কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে তাঁদের জন্য বার বার চা চেয়ে পাঠিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না এবং মনোরমা একদিন স্পষ্টই ব'লে দিলেন, 'তোমার ঐ যতরাজ্যের বেকার বাউণ্ডুলে বন্ধুদের জন্যে কে একশবার চা করবে তাই শুনি? একটা ত ঠাকুর, এই ছেলেপুলের ঘরকন্না, সকলের আফিস-আদালত আছে—একশবার যদি ভাতের হাঁড়ি দুধের কড়া নামিয়ে চা করতে হয় তাহ'লে কি সময়ে রান্নাই হবে, না ঠাকুরই টিকবে? তোমার বাপু যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড!' তখন মহেশবাবু একরকম তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিষেধই ক'রে দিলেন আসতে। একাই বসে থাকতেন, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত একটা ক'রে বই আসত কাগজ শেষ হ'লে সেটা পড়তেন। কি ভাগ্যি ছোট ছেলে বাপি এটা রোজ বদলে এনে দিত সন্ধ্যাবেলা, নইলে যে কি করতেন—হয়ত সত্যিই কড়িকাঠ গুণতে হ'ত!

আর একটি কাজ ছিল তাঁর, উঠে উঠে তামাক সাজা। আগে চাকরই এটা ক'রে দিত, কিন্তু সেখানেও একদিন মনোরমার অসন্তোষ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল—'তোমার সংসারে কাজ বাড়ছে বৈ কমছে না ত, সে তুলনায় ঝি-চাকর ত আর বাড়েনি। তামাক খাওয়াটা একটু কমাও। অত মুহুর্মুহু কে তামাক সাজে বলো দিকি!' সেদিন থেকে ও কাজটা মহেশবাবু নিজেই ক'রে নিতেন। স্নানাহারের কোন তাড়া ছিল না যেমন তাঁর, —স্বাধীনতাও ছিল না। ঠাকুর সময় মত এসে বলত, 'বাবু চান ক'রে

নেন। অনেক বেলা হয়েছে।' তখনই উঠে স্নান করতে হ'ত। একটু গড়িমসি করলেই মনোরমার বিরক্তি ধ্বনিত হ'ত—'তিনপোর বেলা অবধি যদি হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে বসে থাকতে হয় ত ঠাকুরের চলে কি ক'রে বলো দিকি। সেই কোন্ ভোরে লেগেছে! আবার আড়াইটে না বাজতে বাজতে উনুনে আঁচ পড়বে, একটু বিশ্রাম করার সময় দেবে না?' অগত্যা উঠে ও-পাট চুকিয়ে ফেলতে হ'ত। কোনদিন চৌবাচ্চায় জল থাকত কোনদিন থাকত না, যেদিন থাকত না—সেদিন স্নানটা বাদ দিতেন, কাউকে কিছু বলতেন না, কাকেই বা বলবেন? পনেরো ষোলটি ছোট ছেলেমেয়ে যে বাড়ীতে—সে বাড়ীতে জল বেহিসেবী খরচ করার জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না।

আবার চলত সেই বই আর তামাক। বেলা তিনটেয় চা আসত। রাত্রের খই-দুধ গৃহিনীই নিয়ে আসতেন এক একদিন, কারণ এই সময়টা ছিল তাঁর সংসারের খরচ-বৃদ্ধির ইতিহাস শোনানো এবং বাড়তি কিছু টাকা দাবী করার অবসর। কর্ত্তা ঠাকুর-ঘরে উঠতেন না। এই ঘরেই কুলুঙ্গিতে একটু গঙ্গাজল থাকত—ফুরিয়ে গেলে আগে হাঁক-ডাক করতেন, ইদানীং ব্যাপারটা বৃথা জেনে নিজেই উঠে গিয়ে ঠাকুর-ঘরের দোরে হাজির হোতেন। ঐটুকু ছিল বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। আগে আগে রাত্রে একবার শুতে যেতেন দোতলার ঘরে কিন্তু তাও শেষ পাঁচ বছর ত্যাগ করেছিলেন। গৃহিণীর সবাইকে নিয়ে 'গ্রুপ' ফটো তোলবার সখ হ'তে যখন চারটি মেয়েই জামাই সুদ্ধ এসে হাজির হোলেন তখন মনোরমা বললেন, 'একটা ঘর তুমি ছাড় বাপু। একটা মানুষ দুটো ঘর জোড়া ক'রে থাকলে চলে কি ক'রে?' তখন তিনি ওপরের ঘরটাই ছেড়ে দিলেন—সেই সঙ্গে

খাট বিছানাও, একটি ছোট তক্তাপোষ কিনে এনে পৃথক্ শয্যা তৈরী হ'ল। মহেশবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যু-শয্যা!' কিন্তু সেটাও ঠিক না, কারণ ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খেতে খেতেই কখন যে তাঁর মৃত্যু হ'ল তা যেমন কেউ টের পায়নি, বোধ হয় তিনি নিজেও তেমনি বুঝতে পারেন নি।

সম্পর্ক থাক্ বা না থাক্, বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে কর্ত্তার মৃত্যু অত নয়। সিঁড়ির আড়ালে ঐ কোণের ঘরটা চোখের বাইরে থাক্‌তে থাক্‌তে মনেরও বাইরে চলে গিয়েছিল সকলের—মহেশবাবুর অস্তিত্ব এক একসময় মনোরমাই ভুলে যেতেন। কিন্তু ভদ্রলোক ম'রে যাবার পর তাঁর কথাটা একটু বেশী রকমই মনে পড়ল। মনোরমা কাঁদলেন—এটিও জীবনের অঙ্গ। ছেলেমেয়ে সবাই কাঁদল। তারপর ঘর-বাড়ী ধোওয়া মোছা, হবিষ্যির যোগাড়—নানা রকম ব্যাপারে বিরাট হৈ-চৈ-তে কাটল পরের দিনটাও। তার পরের দিন বেলা তিনটের সময় বড় দুই ছেলে একটু গম্ভীর মুখে মার কাছে এসে বসল।

সংসারের পাট সেরে আর একবার স্নান ক'রে আবার নিজের হবিষ্যির যোগাড় করা—মনোরমার খেয়ে উঠতেই তিনটে বেজেছে। তিনি মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এখন দুই ছেলেকে একত্রে আসতে দেখে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

মেজ ছেলে রাজেন সরকারী চাক্‌রী করে—সে দাদার মত মুখফোঁড় নয়। কিন্তু বড় ছেলে অনঙ্গ উকীল, তার সময়ের মূল্য আছে। রাজেনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সে-ই কথাটা পাড়লে সোজাসুজি, 'তাহ'লে শ্রাদ্ধের কী রকম কি করা যাবে, মা?'

মনোরমা এটা তাঁর প্রাপ্য ব'লেই মনে করেন। সমস্ত সংসার তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্ত্তিত হয়, চিরকালই হ'য়ে আসছে। চিরকাল সকলেই তাঁর মতে চলে। এ ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক নিয়মেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে, তবু তিনিই বা আর এ দায়িত্বে থাকবেন কেন? উদাসীন ভাবে বললেন, 'সে আর আমি কি বলব বাছা, তোমরা বড় হয়েছ, যা করলে ভাল হয়, ওঁর সম্মান বাঁচে সেইরকমই ক'রো।

অসহিষ্ণু ভাবেই অনঙ্গ বললে, 'সে কথা ত হচ্ছেনা, আসল কথাটা বলো—টাকার কথা। হাতে কি রকম আছে বলো, সেই বুঝে তিল-কাঞ্চন হবে না বৃষ হবে ঠিক করব।'

মনোরমা আকাশ থেকে পড়লেন, 'টাকা! টাকার কথা আমি কি জানি বাবা, উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন পেন্‌সনের টাকাটা হাতে তুলে দিতেন, খরচ করেছি। এছাড়া তোমরা ত দিয়েছ কেউ কোন মাসে চল্লিশ, কেউ পঞ্চাশ। তাতে ত কখনই কুলোত না—মাসের শেষে হাত পাততুম, কত ঝগড়া ক'রে তবে আর কিছু কিছু বার করতেন। কোথা থেকে দিতেন, কি ছিল তাঁর, তা ত কোনদিন খোঁজ করিনি। আলমারির মধ্যে একটা হাতবাক্স ছিল, তাই থেকেই বার করতেন দেখেছি। তা সে চাবী ত তুমিই নিয়েছ ওঁর পকেট থেকে বার ক'রে।'

'সে ত রাজেনের সামনেই খুলেছি মা। একশ ত্রিশটি টাকা নগদ, দশখানা গিনি আর পোষ্ট আফিসের খাতা একটা, তা তাতেও দেখেছি নব্বুইটি টাকা পড়ে আছে। ওঁর ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পেয়ে জমা করেছিলেন, তাই থেকে মধ্যে মধ্যে তুলেছেন—এইত দেখলুম। তা বাকি?'

মনোরমা ওর বলবার ভঙ্গীতে আহত হলেন, 'বাকী কোথায় আমি কি

ক'রে জানব বাবা। আমাকে কি তিনি কোন কথা বলতেন, না আমিই জিজ্ঞাসা করেছি? আমার সে সময়ই বা কোথায়? বলে এক দণ্ড মরবার ফুরসৎ নেই!'

'তবে এ সব হবে কি ক'রে?' একটু রুষ্ট ভাবেই বলে রাজেন।

'সে কথা কি আমি বলব? তোমরা তাঁর উপযুক্ত ছেলে—শ্রাদ্ধ করবে—কী করবে তা তোমরাই জানো, যা পারবে তাই করবে।'

অনঙ্গ ওকালতি-বুদ্ধির শরণ নিলে, 'না—সে ত বটেই। বলছিলুম, তুমি তোমার টাকা থেকে যদি কিছু দিতে—'

মনোরমা আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমার টাকা? আমি কি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছি! যখন চাকরী ছিল ওঁর তখন দু-একটা টাকা জমিয়েছিলুম যা—তা এক একবার মেয়েদের এক এক হিড়িকে সব বেরিয়ে গেছে। নাতী-নাত্‌নিদের অন্নপ্রাশন—এটা ওটা, তার এক পয়সাও নেই।'

রাজেন রাগ ক'রে বললে, 'বেশ, তাহ'লে ঐ কালীঘাটে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসি, আমরা কোথায় কি পাবো?'

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে মনোরমা বললেন, 'তোমরা কি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধ করবে এই ভরসায় ছিলে? তা ওঁর মত লোকের শ্রাদ্ধ যদি কালীঘাটে গিয়ে করতে চাও ত করো, কী বলব। তোমরা উপযুক্ত ছেলে।'

'উপযুক্ত ত কত! দাদা নতুন উকীল, সবে এই দশবারো বছর বেরোচ্ছে, কত রোজগার ওর? আর আমার চাকরী ত বাবাই ক'রে দিয়েছিলেন। কত মাইনে পাই তা ত জানোই। ছেলেমেয়েদের দুধের টাকা আলাদা

দিয়ে, কাপড় জামা সব ক'রে তোমাকে সংসার খরচের টাকা ধরে দিয়ে কি থাকে? টাকার কি গাছ পোঁতা আছে আমাদের কাছে? যে নাড়া দিলেই পড়বে!'

মনোরমার খুব ঝাপ্সা ঝাপ্সা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল যে এমনি কথা এর আগেও কার কাছ থেকে শুনেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, যেবার সব ক'টি মেয়ে জামাই এসে রইল প্রায় একমাস, সেবার উনি বাড়তি খরচ করেছিলেন পুরো পাঁচশ টাকা। সেইবারই মহেশবাবু কথাটা বলেছিলেন। তার জন্য কী লাঞ্ছনাই না করেছিলেন মনোরমা তাঁর। ওঁর বাক্যবাণে বিব্রত হয়ে মহেশবাবু যখন টাকাটা বার ক'রে দিয়েছিলেন তখনও রেহাই দেন্‌নি তাঁকে, বলেছিলেন, 'আমি টাকা চাইলেই অমন করো কেন বলো ত।··· ঘেন্না করে আমার এমন ক'রে হাত পাত্‌তে। এ কী আমি নিজের কোন সখ করব ব'লে নিই? তোমারই সংসারে লাগে ব'লে নেওয়া!'

তখন মহেশবাবুও কিছু বলতে পারতেন, বলতে পারতেন যে এই এতগুলি লোককে তিনি সখ ক'রে ডেকে আনেননি—তাঁর গরজে সংসারের কলেবর এবং ব্যয় বাড়েনি—কিন্তু কিছুই বলেন নি তিনি, শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন মাত্র।

শ্রাদ্ধটা কোন রকমে তিলকাঞ্চন ক'রেই হয়ে গেল। পাড়ার লোকে কেউ কেউ মনোরমাকে শুনিয়েই বললেন, 'অত বড় বাড়ী—পাঁচশো টাকা ক'রে ত পেন্‌সনই পেত—তার কাজ এমন ক'রে সারা তোমার উচিত হয়নি ভাই। তারই ত সব—অথচ তার কাজটাও ভাল ক'রে করলেনা? না হয় কিছু ভাঙতেই জমা পুঁজি থেকে। এই ত শেষ কাজ!'

অপমানে মনোরমার দুই কান জ্বালা করেছে, দু-চোখ এসেছে ঝাপ্‌সা হ'য়ে তবু কিছু বলতে পারেন নি। সব কথা ত বলা যায় না।

কিন্তু সবচেয়ে আঘাত লাগল, যখন শ্রাদ্ধের পর বড় ছেলেকে ডেকে বলতে গেলেন, 'খরচ-পত্তর ত হাতে কিছুই নেই বাবা, টাকা কড়ি দে কিছু কিছু তোরা।'

অনঙ্গের মুখের হাঁ কিছুক্ষণ বুজলই না, 'টাকা! টাকা কোথায় পাবো? এই যার একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে। এখন আর কিছুদিন ওকথা মুখে উচ্চারণ করো না।'

'ওমা, না করলে চলবে কিসে? এই রাবণের সংসার—এর খরচা কি কম?'

'রাবণের সংসার রাখলে চলবে কেন বলো। বাবার টাকা ছিল যা খুশি করেছিলেন—এখন হয় খরচা কমাও, না হয় নিজের পুঁজি ভাঙ্গো!'

আবারও সেই সংশয়।

মনোরমা ঝনাৎ ক'রে চাবিটা আঁচল থেকে খুলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'সব খুলে দেখে এসো বাবা, কোথায় কি পুঁজি রেখেছি। থাকে বার ক'রে নাও।'

অনঙ্গ একটু অপ্রতিভই হ'ল, 'সে কথা ত হচ্ছে না, আমাদেরও ছেলেপুলে আছে—ধার ক'রে ত সর্ব্বস্বান্ত হ'তে পারি না। যা হয় ক'রে চালাও। দেখো রাজি কিছু দেয় কিনা—ঐ বা কোথায় পাবে তা ত জানি না। তবে আফিসে কো-অপারেটিভ্‌ থেকে ধার পেতে পারে।... শ্রাদ্ধ ত মিটেই গেছে, এখনও মেয়েদের বসিয়ে রেখেছ কেন? সব পাঠিয়ে দাও না—'

মনোরমার চোখে জল এসে গেল, 'তোমরাই ঘাড় ধ'রে পাঠিয়ে দাও বাবা। আমার পেটের মেয়ে আমি কি ক'রে বলি যে বেরিয়ে যাও। এই শোক-তাপের সময়, আমি একটু ভুলে থাকব ব'লে ওরা আছে, নইলে কি তোমাদের অছেদ্দার ভাত খাবার জন্যে পড়ে থাকত?'

অনঙ্গ বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ তোমার বড় দোষ মা, সব কথা বাঁকা ভাবে ধরো, আমি কি তাই বলছি।...এই অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছ। আজকালকার বাজার—খরচ-পত্র ত কম নয়, বাবা ছিলেন মাথার ওপর, তিনি কি ক'রে চালাতেন তিনিই জানতেন। এখন আমরা পেরে উঠব কি ক'রে বলো। আয়টা ত রবারের জিনিষ নয় যে ইচ্ছে ক'রে টেনে বাড়াব। আর বাবাকেও ত ঐ ক'রেই সর্ব্বস্বান্ত করেছ—তখন যদি একটু বুঝে চল্‌তে তাহ'লে এই ব্যাপারটা হ'ত না। অতবড় একটা লোক মারা গেল—অথচ তার ছেলেরা এক পয়সা পেলে না, উল্‌টে ধার ক'রে শ্রাদ্ধ করতে হ'ল!'

মনোরমার মনে পড়ল মহেশবাবুও একবার মেয়েদের নিয়ে তাঁকে খোঁটা দিয়েছিলেন। ছেলেদের সংসার ছাড়াও একশ সাতাশ টাকা দুধের বিল দেখে ব'লে উঠেছিলেন, 'কী সর্ব্বনাশ! এ কি করেছ?'

তাতে মনোরমা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'দুধ কি আমি খাই এক ফোঁটা যে আমাকে শোনাচ্ছ? তোমার তিন মেয়ের দরুণ, বলতে নেই, সতেরোটি নাতি-নাতনি!'

কর্ত্তা হেসে বলেছিলেন, 'এর চেয়ে ঘরজামাই রাখা যে ভাল ছিল নতুনবৌ, সে তবু জামাইদের মাইনের টাকাগুলো হাতে আসত!'

তার ফলে মনোরমা রাগ ক'রে দু' দিন খাননি—কান্নাকাটি, অভিমান —কর্ত্তা হাতে পায়ে ধ'রে মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন।

আজ কেমন ক'রে মনের মধ্যেই বুঝতে পারেন মনোরমা যে এদের কাছে সে অভিমানের কোন মূল্য নেই।...

দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও ফেলতে লজ্জা করে, কোন মতে চেপে গিয়ে বললেন, 'তা এখন কি করবো ব'লে দাও, এক টুক্‌রো কয়লা নেই, রেশন আনতে হবে—ধোপা হিসেব চাইছে, রকমারি খরচা। অথচ আমার হাতে ত মোটে তিন চারটি টাকা প'ড়ে আছে—'

'বলো কি! না—না এমন করলে ত চলবে না। এই ত বাবা মরবার পরে দেখলুম পাঁচ মণ কয়লা এল—! না, তুমি দেখছি হিসেব ক'রে চলা কাকে বলে কিছুই জানো না। আজ সন্ধ্যাবেলা রাজেনের সঙ্গে বসতে হবে—আয় ব্যয় বুঝতে হবে, এমন করলে চলবে কি ক'রে, সে কত দেয় আমি কত দিতে পারি বুঝে চালাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—আমাদের খরচ কাপড় জামা, দুধ ওষুধ, ডাক্তার সব ত নিজেরাই করছি, তার ওপর শুধু ডাল ভাতের জন্য একগাদা ক'রে টাকা দেবই বা কেন, আর পাবোই বা কোথায়? আজকাল ওকালতির যা আয়!'

ওকালতির এই আয়েই বড় বৌমা গত মাসেও নতুন গয়না গড়িয়েছেন। শ্যালীর বিয়েতে তার আগের মাসে অনঙ্গ আড়াই ভরির কঙ্কণ দিয়েছে। তাছাড়া তিনটে ইন্‌সিওরেন্স আছে মোটা টাকার। কিন্তু সে সব কথা মনে করিয়ে দিতে ঘৃণা বোধ হ'ল তাঁর, তিনি শুধু বললেন, 'তাই ভাল বাবা, তোমরা সংসারের ভারটা বুঝে নাও, আমি ত বাঁচি তাহ'লে।'

রুষ্ট কণ্ঠে অনঙ্গ বললে, 'ওভাবে এলিয়ে দিলে ত চলবে না। সবাই

মিলে পরামর্শ ক'রে খরচ কমাতে হবে। মেয়েদের ওপর তোমার অহেতুক টান। আজ না হয় শ্রাদ্ধের জন্যে এসেছে, শোকতাপের সময়—কিন্তু চিরকালই ত দেখছি দুটি তিনটি মেয়ে তোমার কাছে রাখা চাই-ই। কেন রে বাপু, তাদের বিয়ে-থা হয়েছে, ঘরকন্না আছে নিজেদের, জামাইরা কেউ অক্ষম নয়—বাবা দস্তুরমত খরচ ক'রেই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন সৎপাত্র দেখে, সে সব টাকা আজ থাকলে আমাদের অভাব কি?—তাদের এনে এখানে জীইয়ে রাখার দরকারটা কি? এর জন্যে বাবাকেই কি কম দুঃখটা দিয়েছ তুমি?'

আড়ষ্ট হয়ে যান মনোরমা, এখনও যোলটি দিন কাটেনি কর্তা গেছেন—এরই মধ্যে এত কথা শুনতে হবে তা কি তিনি স্বপ্নেও ধারণা করে-ছিলেন? ঐ ত সকলের চোখের আড়ালে ব'সে তামাক খেতেন—আছেন কি না কেউ খোঁজও করেনি—নাতি-নাত্‌নিদের ডেকেও বেচারি সাড়া পেতেন না—তবু তাতেই মনোরমার যে প্রতাপ ছিল আজ আর তার কিছুই নেই? গৃহিণী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি-সমস্ত কিছু হ'ত তাঁর মত আর নির্দেশমত, খাওয়া-দাওয়া, বাজার-হাট, লোক-লৌকিকতা সব কিছু। কাদের জন্যে করেছেন তিনি এসব? সে কি নিজের কোন লাভে? উদয়-অস্ত খাটুনি খেটেছেন, এক মিনিট স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত যাবার ফুরসৎ পান নি—তার আজ ভাল পুরস্কারই পেলেন বটে!

নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মনোরমার। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন তিনি—কেউ না দেখে।

সন্ধ্যাবেলা পরামর্শ সভায় রাজেন বললে, 'এস্টাব্লিশমেণ্ট কমাও।

একটা ঝি, একটা ঠাকুর আবার একটা চাকর—এত কেন? চাকরটা ছাড়িয়ে দাও। বোনেরা যদি কেউ না থাকে ত ঘর-দোর মোছার কাজ ঝিই করতে পারবে। বাজার আমরা পালা ক'রে করে দেব এখন। আর রেশনটা বাপি আনতে পারবে না? বাপিকে বলো বরং একটা টুইশ্যানি খুঁজে নিতে, ওর নিজের হাত খরচটাও যদি চালাতে পারে সেটাও ত কম নয়।'

বাঃ! মনোরমা হাসলেন মনে মনে। বিধাতার বিচার ঠিকই নেমে আসে—কিছুমাত্র ভুল হয় না। বাজার আগে ছেলেরাই করত—রাজেনের চাকরী হবার পরই সে ছেড়ে দিলে। সকালে বাজার ক'রে দাড়ি কামিয়ে আফিস করবে কখন! চাকর তখনই রাখা হ'ল। মনে আছে পেন্‌সন্‌ পাবার পর কর্ত্তা প্রস্তাব করেছিলেন চাকর ছাড়িয়ে দেবার—মনোরমাই ঝগড়া করেন, 'তোমার যেমন কথা! এতবড় সংসারের বাসন নিয়েই ত ঝিয়ের দিন কেটে যায়। ধোয়া মোছা করে কখন? তাছাড়া বাজার, হাট, দোকান—কী নেই?...অনঙ্গের মক্কেলরা আসে সকালে, রাজেন অত তাড়াহুড়ো করতে পারে না—বাপিরও পড়াশুনো, চাকর না হ'লে চলে কখনও?'

আরও মনে হ'ল এই নতুন চাকরটা একবার মহেশবাবুর কথা শোনেনি, উল্টে আবার মুখের ওপর কি বলেছিল, মহেশবাবু বলেছিলেন ওকে জবাব দেবার কথা। সেদিনও মনোরমা কম কটু কথা বলেন নি স্বামীকে, 'তোমার কি ভীমরতি হয়েছে নাকি? আজকালকার দিনে চাকর পাওয়াই দায়, নতুন লোক ব'লেই অত কম মাইনেতে পেয়েছি। ও গেলে কি আর ঐ টাকায় লোক পাবো ভেবেছ? এই রাবণের সংসার, তোমার কথায়

লোক ছাড়িয়ে দিয়ে সবাই মিলে লোক খুঁজতে বেরুই। বেশ বুদ্ধি ত তোমার!'

সেই বোধ হয় মহেশবাবুর শেষ বিদ্রোহ। আর কখনও কাউকে কিছু বলেন নি। ঝি-চাকর, নাতি-নাত্নি—ইদানীং কেউ তাঁর কথা শুনত না, একমাত্র বাপি এটা ওটা ক'রে দিত তাঁর। হায় রে! সেদিন যদি সংসারের চেহারাটা চোখে পড়ত!

কানে গেল অনঙ্গ বলছে, 'কাগজ কলম নিয়ে নিখুঁত এস্টিমেট কষো—কে কতো টাকা দিতে পারবে সেটাও ফ্যালো। আমি ত দুশো টাকার বেশী এক পয়সাও কন্ট্রিবিউট করতে পারব না।'

রাজেনের কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'বা রে, তা বললে চলবে কেন? আমার ত গোনা টাকা মাইনে। তোমার বরং নানাদিকে আয়...'

ক্রমশ আবহাওয়া অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। মনোরমা আস্তে আস্তে উঠে যান নিঃশব্দে।

ওপরে তখন তিন মেয়ে ব'সে জটলা করছে।

মনোরমার কানে গেল বড় মেয়ে বলছে, 'সত্যি, বাপের বাড়ী থেকে কত মেয়ের ত্যাখো মোটা মোটা মাসোহারা যায়, আমরা ত কখনও কণা রত্তি পেলুম না। এসেছি খেয়েছি ভাত-হাঁড়ির ভাত এই পর্য্যন্ত। শ্বশুর বাড়ী যাবো, সবাই বলবে অত বড়লোক বাপ ম'লো, তোমরা কি পেলে?'...

'আর আসাও ত ঘুচল! ভায়েদের যা কথার ধরণ, এ-মুখো আর হ'তে হচ্ছে না। মার হাতে দু-এক পয়সা থাকত তবু জোর হ'ত—এই শেষ আসা বাপের বাড়ীতে, ধ'রে রাখো। ভাইপোদের বিয়ে পৈতেয় যে ডাকবে তাও মনে হয় না।'

সেজ মেয়ে বললে, 'মা-ত কখনও হিসেব ক'রে চলে নি, এন্তার এলোপাতাড়ি খরচা করেছে। নইলে লক্ষপতি বাপ আমাদের, তাঁর শ্রাদ্ধ করার পয়সা থাকে না।'

বড় মেয়ে বলে, 'আর তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে কী ঝগড়াটাই করত। সত্যি কথা বলব বাপু, এদাস্তে মা একটা দিনের জন্যেও বাবাকে শান্তি দেয় নি। বাবা চুপ ক'রে থাকতেন তাই—মনে হ'লেও বুক ফেটে যায়!…'

মনোরমা আর শুনতে পারেন না, পায়ের নীচে সমস্ত মাটিটা যেন কাঁপছে তাঁর। কোন মতে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠে ঠাকুর ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়েন। ঠিকই হয়েছে তাঁর, এইটুকু শুধু বাকী ছিল, যাদের জন্যে সকলের কাছে কলঙ্কভাগী হলেন তাদেরই উপযুক্ত কথা বটে।

মহেশবাবু একদিন বলেছিলেন, 'একদিন বুঝবে নতুন বৌ। সংসার সংসার ক'রে অস্থির হচ্ছো—সংসারের শেষ পাওনাটা পেলে বুঝবে!'

এই কি শেষ পাওনা?

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেখলেন নীচে কোণের সেই ঘরটা থেকে তাঁর স্বামীর জিনিস-পত্রগুলো টেনে বাইরে ফেলা হচ্ছে।

'এ কী ব্যাপার রাজি?'

'ঘরটা ভাড়া দিতে হবে মা। এইটেই একটেরে আছে—ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এক কবিরাজ ভাড়াটে জুটেছে, চল্লিশ টাকা ক'রে দেবে।… তা নইলে ত আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। অন্তত বাপির খরচটাও যদি চলে—'

বাপি কালই বলছিল সে পড়া ছেড়ে চাকরী খুঁজবে। কিন্তু সে কথা

আর মনোরমা তুললেন না। জঞ্জালের গাদা থেকে মহেশবাবুর টিকে তামাকের বাক্স আর হুঁকো-কলকেটা তুলে নিয়ে ওপরে গিয়ে বাপিকে বললেন, 'ওঁর ঐ বসবার ইজিচেয়ারটা আমার ঘরে দিয়ে যাবি বাবা?'

'কী হবে মা? ও ত ভেঙ্গেই গেছে—'

'তা হোক্, ওটা এনে দে বাবা।'

তখনও চাকর ছিল, সে আর বাপি ধরাধরি ক'রে চেয়ারটা মনোরমার ঘরে তুলে দিলে। বড়বৌ দেখে-শুনে মুখ টিপে হেসে বললে, 'তবু ভাল! মরবার পর শ্বশুর ঠাকুরের একটু কদর হ'ল এ বাড়ীতে!'

কথাটা মনোরমার কানে যেতে কোন বাধা ছিল না, তাঁকে ভয় করার আর কোন কারণ নেই এ বাড়ীতে। এখন বড়বৌই গিন্নি।

চেয়ারটা রেখে ওরা চলে যেতে মনোরমা অনেকক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্বামীর শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সেইখানে মেঝের ওপর ব'সে প'ড়ে চেয়ারের একটা পায়া জড়িয়ে ধ'রে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো, তুমি আমাকে মাপ করো। আমাকে মাপ করো!'

যোদ্ধা

এত ছেলে থাকতে সতীশবাবু যখন বাপিকেই বেছে নিলেন তখন একটা উপহাসের ঝড় বয়ে গেল তাঁর ওপর দিয়ে। সতীশবাবু কিন্তু সে উপহাস গ্রাহ্য করেন নি—করবার কথাও নয়, কারণ তিনি তখন সবে বি-এ পাশ ক'রে ইস্কুল মাস্টারীতে ঢুকেছেন, এম-এ পড়ছেন প্রাইভেটে—বিদ্রূপ বা উপহাস অগ্রাহ্য করবার মত মনের জোর তাঁর যথেষ্টই আছে। যে মানুষ দুর্ব্বল, যার আত্মবিশ্বাসের অভাব, সে-ই বিদ্রূপে বিচলিত হয়।

এসে পর্য্যন্ত পুরাতন মাস্টার মশাইদের সঙ্গে তাঁর তর্ক চলেছে এই ব্যাপার নিয়েই। সতীশবাবু বলেন, ভাল ছেলে বা খারাপ ছেলে ব'লে কিছু নেই। মনীষা বা প্রতিভা দু-একজনের থাকে, তারা ঈশ্বরের চিহ্নিত করা, মহামানব। এছাড়া প্রায় সব ছেলেই অল্পবিস্তর সমান। কারুর বুদ্ধি প্রকট, কারুর বা আচ্ছাদিত। সে বুদ্ধির ওপরের ছাই সরিয়ে আগুনটাকে ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা দহনশক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। তখন তাতে ঠিকমত ইন্ধন জুগিয়ে যান—দেখবেন আগুনের অভাব হবে না।

বলা বাহুল্য, এ নিয়ে বিস্তর তর্ক উঠেছিল। এর জবাবে অনেক কিছুই বলবার ছিল এবং তা তাঁরা ব'লেও ছিলেন। দৃষ্টান্ত উদাহরণের অভাব ছিল না কোন পক্ষেই। সতীশ নিজের যুক্তির স্বপক্ষে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বাণী উদ্ধার করেছিলেন—অন্য শিক্ষকরাও ছাড়েন নি। বিশেষতঃ হেড মাস্টার—'এই ছোকরাটির তর্ক করার ভঙ্গী, ঔদ্ধত্য এবং যুক্তি-প্রয়োগকে

ধৃষ্টতা ব'লেই মনে করেছিলেন। নেহাৎ বর্ত্তমান সেক্রেটারীর এককালীন ছাত্র ব'লে সতীশবাবুকে তিনি তাড়াতে পারেন নি—বিশেষতঃ বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্স্-এ প্রথম হয়েছে যে, তাকে তিনিও মনে মনে সমীহ করতে বাধ্য, কারণ ও বস্তুটি তিনি পাননি।

সতীশবাবু বলেছিলেন, 'আসলে এই ছাঁচে-ঢালা শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী এই সব ছেলের পাঠে অমনোযোগ বা বিতৃষ্ণার জন্য। ঐ যে সেকেণ্ড ক্লাসের অরবিন্দ—প্রত্যহ ক্লাস পালিয়ে রাস্তায় গুলি খেলে—দুষ্টুমিতে ওর মাথা কেমন সাফ্ দেখেছেন ত? নিত্য নূতন নূতন বদ্মাইসীর উদ্ভাবন হয় ওর মাথায়। ওকে আপনি বোকা বলবেন?'

তারপর একটু থেমে সোজা য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ষোড়শীবাবুকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ যে উনি—কালই আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলুম ওঁকে। ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই চাইলেন হোমটাস্ক। যারা এনেছে তাদের খাতায় চোখ বুলিয়ে একটা ক'রে সই ক'রে দিলেন। যারা ভুল করেছে তাদের খাতায় ঢ্যারা দিলেন—যারা ভুল করেনি তাদের কাছে খোঁজও নিলেন না যে, সে অঙ্ক তারাই করেছে, না অপর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। আর যারা আনেনি তাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর উঠে গিয়ে বোর্ডে নতুন অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে সুরু করলেন। বাকী যতক্ষণ রইলেন ক্লাসে—এক মিনিটও বিশ্রাম করেন নি। আপনি একথাও বলতে পারবেন না যে, উনি একটি মিনিট ফাঁকি দিয়েছেন। অথচ ফল কি হ'ল? কোন্ ছেলে বুঝল আর কোন্ ছেলে বুঝল না—তার উনি কোন খবরই রাখলেন না। যারা টাস্ক আনেনি তাদের উনি শাস্তি দিয়েই খালাস—কেন আনেনি, বুঝতে পেরেছে কি না—সেকথা প্রশ্ন করাও উনি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করলেন না।'

ষোড়শীবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল, উনি বললেন, 'আমি বোঝাবার সময় প্রত্যেক স্টেপে জিজ্ঞাসা ক'রে নিই ওরা বুঝেছে কিনা!'

সতীশ বললেন, 'আপনারাও ত ছাত্র ছিলেন এক সময়। আপনাদের শিক্ষকরাও অমনি জিজ্ঞাসা করতেন—না বুঝলেও আপনারা উঠে সে কথা বলতেন কি?'

মুখ গোঁজ ক'রে ষোড়শীবাবু বললেন, 'তার চেয়ে বেশী আর কি করতে পারি বলুন—পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো ক্লাস। এর ভেতরে কি আর প্রত্যেক ইন্‌ডিভিজুয়াল ছাত্রের খবর রাখা সম্ভব!'

'কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব তো আপনারা নিয়েছেন। ওরই মধ্যে কি ক'রে সে দায়িত্বের মর্য্যাদা রাখতে পারেন সেটা ভাবা দরকার।'

ভূগোলের মাস্টার অমিয় গোঁসাই বললেন, 'বেশ ত ভায়া, একজাম্পল্‌স্ আর বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট্‌স্—তুমি ক'রে দেখিয়ে দাওনা—কী ক'রে সে মর্য্যাদা থাকে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব বৈ কি!'—সতীশবাবু প্রশান্ত কণ্ঠেই বলেন, 'কিন্তু একার দ্বারা আর কতটা সম্ভব!'

'একটিকেই দেখুন না! আপনার থিওরী যদি সত্যি হয় তাহ'লে খুব খারাপ রেজাল্ট যে করেছে তাকেও পাশ করানো যাবে—তেমনি কোন ছাত্রকে বেছে নিয়ে তাকে মানুষ ক'রে দেখিয়ে দিন যে, মনোযোগ দিলে সব ছেলেই মানুষ হতে পারে। তাহ'লে আমাদেরও শিক্ষা হবে।' কণ্ঠে মধু ঢেলে দেন ষোড়শীবাবু।

'বেশ ত তেমনি একটা ছেলে বেছে দিন না! দেখি রেজাল্টের খাতাটা।'

নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন সতীশবাবু। যেন চ্যালেঞ্জ করেন ষোড়শীবাবুকে, অথবা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

খুঁজতে খুঁজতে ক্লাস সিক্স-এর বাপির নাম পাওয়া গেল। অতুল্য রায়-চৌধুরী—ইংরেজী শূন্য, অঙ্ক শূন্য, বাংলা সাত, ইতিহাস দশ, ভূগোল ত্রিশ।

'এই ত! চমৎকার ছেলে। একেই আমি বেছে নিলাম। ছেলেটিকে ডেকে পাঠান ত ষোড়শীবাবু, দেখি।'

বেয়ারা নিয়ে এল ছেলেটিকে। রোগা ছিপছিপে বেচারী বেচারী ছেলে। দেখতে সুশ্রীই বলা চলে—কিন্তু মুখের মধ্যে কোথাও বুদ্ধির কোন ছাপ নেই।

'তোমার নাম অতুল্য? ডাক নাম কি?'

'ডাকনাম বাপি, স্যার।' সবাই হেসে উঠলেন। এ ডাকনাম বলে কেউ! বাপির মুখও লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সতীশবাবু বললেন, 'বেশ। বেশ। ভারি মিষ্টি নাম। কে ডাকেন এ নামে—বাবা?'

'বাবা নেই স্যার—মারা গেছেন।'

সতীশবাবু একটু অপ্রতিভ হলেন, 'কে আছে আর তাহ'লে?'

'মা আছেন, আমরা দুজন পিসে মশাইয়ের কাছে থাকি।'

'অ। তাহ'লে তোমার পিসে মশাই-ই গার্জ্জেন। আচ্ছা, আজ ছুটির পর আমাকে তুমি নিয়ে যেও তো তোমাদের বাড়ী, চিনে আসব।'

আশঙ্কায় বাপির মুখ শুকিয়ে উঠল, একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'আর কখনও এমন হবে না স্যার, খুব মন দিয়ে পড়ব এবার থেকে। এবারের মত মাপ করুন, স্যার!'

'না না—ভয় নেই, ভয় নেই। ওসব কোন কথা নয়। আচ্ছা, না গেলেও চলবে। তুমি তোমার মা আর পিসে মশাইকে বলে এসো—কাল

থেকে তুমি সন্ধ্যের সময় আমার কাছে পড়তে আসবে—পড়া শেষ হ'লে আমি এগিয়ে দেব। তাতে যদি অসুবিধা হয় ত ইস্কুলের ছুটির পর এখানেই একঘণ্টা পড়তে পারো। তবে তখন তো তোমার ক্ষিদে পাবে—'

বাপির মুখ যেন আরও শুকিয়ে গেল, 'ক্ষিদে আমার পায় না—কিন্তু স্যার, আমরা যে—মানে মা যে—টাকা দিতে পারবে না স্যার!'

কথা ক-টা বলার অপমানে ওর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

সতীশবাবু হেসে বললেন, 'না না—ভয় নেই। টাকা আমাকে দিতে হবে না। আমি এমনই পড়াবো। বলো ত আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসতে পারি।'

এমনি ভাবে—একেবারে আকস্মিকভাবেই বাপি এসে পড়ল সতীশবাবুর দায়িত্বে।

সতীশবাবু আরও একটা টিউশ্যনী করতেন টাকার জন্য। সেজন্য সন্ধ্যাটায় একটু অসুবিধাই ছিল—ইস্কুলের পরই বাপি ওঁর সঙ্গে যেত ওঁর বাসায়। ইস্কুলের খুব কাছেই একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতেন একটি মেসে। দেশে ওঁর আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ আছে কিন্তু তাদের নিয়ে এসে বাসা করার সঙ্গতি বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না। নেহাৎ পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে আলাদা ঘর নিয়ে থাকতেন, খাওয়াটা মেসেই হ'ত।

ইস্কুল থেকে ফিরে নিজে খেতেন কোনদিন দুধ-মুড়ি, কোনদিন বা দই-চিঁড়ে, বাপিকেও খাইয়ে নিতেন। ছেলেমানুষ হ'লেও বাপির সঙ্কোচ করার মত জ্ঞান হয়েছিল—প্রথম প্রথম তার লজ্জা করত কিন্তু সে লজ্জা সতীশবাবু ভেঙ্গে নিলেন। ওকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অতক্ষণ পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকলে

পড়া মাথায় ঢুকবে না। আর ওকে লেখাপড়া করাতে না পারলে সতীশ-বাবুর অপমানের শেষ থাকবে না। এ হ'ল ওঁর জেদের ব্যাপার।

একদিন বাপির পিসেমশাই এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। একটু লজ্জাও প্রকাশ করলেন, 'অনাথ ছেলে—আপনি যা করলেন তার তুলনা নেই। ও যদি কোনদিন মানুষ হয়ত আপনার গোলাম হয়ে থাকবে। আমার কিছু করা হয়ত উচিত, কিন্তু বুঝতেই ত পারছেন আমিও বড় ছাপোষা—'

ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন সতীশবাবু।

একটা সুবিধা হয়েছিল ওঁর—বাপি লেখাপড়ায় যাই হোক্, এমনি শান্ত, মিষ্ট স্বভাবের ছেলে। উনি যখন পড়াতেন সে মন দিয়েই শুনত।

সেই বছরই সব বিষয়ে পাস ক'রে বাপি প্রমোশন পেলে। তার পরের বছর সেকেণ্ড হ'ল—তার পরের বছর ফার্স্ট!

ষোড়শীবাবুকে জব্দ করার কাজ হয়ত এইতেই শেষ হয়ে গেল কিন্তু বাপিকে আর সতীশবাবু ঘাড় থেকে নামাতে পারলেন না। আসলে ইচ্ছাও ছিল না—বাপি ওঁকে নেশার মত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আরও ভাল ফল চাই, বাপি বিশ্ববিদ্যালয়েও সকলের সেরা হবে এই হ'ল ওঁর সাধনা। ইতিমধ্যে উনি নিজে এম-এ পাশ করেছেন। বি-টি পড়া চলেছে। সতীশবাবুর নামডাক বেরিয়েছে খুব—সেই সঙ্গে ইস্কুলেরও। পুরানো হেড মাস্টার চলে গিয়ে ষোড়শীবাবু হেডমাস্টার হয়েছেন—কমিটি আরও সাতজনকে ডিঙ্গিয়ে সতীশবাবুকেই য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার করেছেন। ফলে অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছেন সতীশবাবু, উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড ক'রে বসছেন প্রত্যহ। যে সংস্কৃতয় এম-এ তাঁকে দিচ্ছেন ইংরেজী পড়াতে, ইংরেজীর লোককে দিচ্ছেন সংস্কৃতের

ভার। সতীশবাবুর মত হচ্ছে, কে কোন্‌টা পড়েছে সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়, কে কোন্‌টা পড়াতে পারে ভাল সেইটেই বড় কথা। গ্রুপ ভাগ ক'রে নিয়েছেন ক্লাসের মধ্যে। ভালো, মন্দ, মাঝারি। প্রত্যেক গ্রুপের দিকে স্বতন্ত্র মনোযোগ দেবেন শিক্ষকরা—সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওপরের দুটো ক্লাসে কম্পাল্‌সরি কোচিং—সব শিক্ষককেই ছুটির পর থাকতে হয় একঘণ্টা—সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সামান্য কিছু বেশি টাকাও আদায় করেছেন সতীশবাবু।

কিন্তু এতে ওঁর আয় বেড়েছে সামান্যই। দেশে কিছু পাঠাতে হয়, এখানের খরচ আছে। তার ওপর সময় কম—বেশী টুইশ্যনও করতে পারেন না। একটা পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন কিন্তু তাতে আয় হয় সামান্যই—অন্য মাস্টার মশাইরা, যাঁদের বই আছে, তাঁরা যেমন নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সব কাজ ছেড়ে বই নিয়ে পড়েন—সতীশবাবু তা পারেন না। প্রকাশক স্পষ্টই বলে, "আমাদের চেষ্টাতে কি আর কিছু হয়? অথররা চেষ্টা করলে তবে বই চলে!"

অথচ বাপি যখন ম্যাট্রিক পাশ করলে তখন তার সব খরচাই এসে পড়ল ওঁর ওপর। ইতিমধ্যে সে যখন ক্লাশ নাইনে পড়েছে তখনই মা মারা যান ওর—তিনি ওর পিসেমশাইয়ের বাসায় ঝি-রাঁধুনীর কাজ করতেন ব'লে ওদের গলগ্রহ মনে হয়নি। এখন হলো, তাই ম্যাট্রিক পাশ করতেই ওর পিসেমশাই চাইলেন তাঁর অফিসে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে। বাপি ছল্‌-ছল্‌ চোখে এসে সেই সংবাদ দিলে।

সতীশবাবু নিজে গেলেন দেখা করতে। ওর পিসেমশাইকে বললেন,

'অসুখ বিসুখ গেল তাই, ত নইলে বাপি আরও ভাল করত, এই অবস্থায় পড়াটা ছাড়িয়ে নেবেন? যাই হোক্ দশ টাকার স্কলারশিপও পেয়েছে—'

'দশ টাকাতে আর কি হয় বলুন। খাওয়া-পরার কথাটা ছেড়েই দিলুম—কলেজের মাইনে, বই, খাতা, জলখাবার—সবটা ধরুন। আমি ছাপোষা মানুষ—আমারও ত ছেলেপুলে আছে!'

সতীশবাবু কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'ওর কলেজের মাইনে, বই, খাতা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আমার। হয়ত কলেজের মাইনে লাগবে না—না লাগলে ওর কাপড় জামাও আমি দেব।'

এবার ওর পিসেমশাই অপ্রতিভ হলেন। বললেন, 'দেখুন আপনার ত কোন দায়ই নেই, আপনি যদি এতটা করেন ত আমি আর বাকিটা পারব না! যেমন ক'রে হোক পারতেই হবে।'

কলেজে ছুটোছুটি ক'রে ফি মাপ করিয়ে নিলেন সতীশবাবু। কিন্তু তবুও খরচ কম নয়। তা ছাড়া শখও আছে। নিজে বিয়ে করেন নি—ছেলেপুলে হয়নি, সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটেছে বাপিকে পেয়ে। ছেলে কলেজে পড়লে বাপের যেমন শখ হয়—সতীশবাবুরও সেই সব শখ দেখা দিল। তিনি একটা ভাল কলম কিনে দিলেন, একটা হাতঘড়ি। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে এটা-ওটা ত আছেই—কোনদিন হয়ত গিয়ে একটা ভাল কাপড়ের স্যুটের অর্ডার দিয়ে বসলেন, কোনদিন বা চামড়া-বাঁধানো খাতা। বাপি অনুযোগ করে, অপ্রতিভ হয় কিন্তু সতীশবাবু শোনেন না।

আই-এস-সি পাস করে যখন বি-এস-সি পড়তে গেল বাপি, তখন খরচ আরও বাড়ল। পিসেমশাই স্পষ্টই ব'লে দিলেন, সামান্য কিছু টাকা না

পেলে তাঁর পক্ষেও খরচ চালানো সম্ভব হবে না। অথচ বাপি ইণ্টার-মিডিয়েটে স্কলারশিপ পেলে না।

বাপি বললে, 'টিউশ্যনী করব।'

সতীশবাবু বললেন, 'না। টিউশ্যনী আমিই করব।'

বাপি বললে, 'তাহ'লে পড়াই ছেড়ে দেব।'

সতীশবাবু অনেক ক'রে বুঝিয়ে বললেন। বললেন, 'বাপি, তোর পড়ার ক্ষতি হবে, বাবা, বিশ্বাস কর্। এ তুই ঋণ ব'লেই নে, পরে শোধ করিস। কিন্তু এখন না। এই কথাটা আমার শোন।'

বাপি শুনলে। তবে ফল হ'ল হিতে বিপরীত। অর্থকরী টিউশ্যনীটা বন্ধ করলেন সতীশবাবু; তাতে শখের টিউশ্যনীটার সুযোগ বাড়ল। সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পরই বন্ধু সুশীলের বোন অচিরাকে পড়াবার এই শখটা চেপেছিল, হয়ত সেইজন্যই স্কলারশিপটা হয়নি। তবে সতীশবাবু অতটা বোঝেন নি।

কিন্তু থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি ব্যাপার চরমে পৌছল। সতীশবাবুর চোখেও পড়ল। তখন কি আর ফেরাবার পথ আছে? এইবার প্রথম যেন হতাশার সামনা-সামনি দাঁড়ালেন তিনি। যদিও হাল ছাড়লেন না।

সে যা সংগ্রাম করলেন সতীশবাবু, বোধ হয় মানুষে কখনও করে না। শুনেছি হিংস্র জন্তুরা শাবককে বাঁচাবার জন্য এমনি একাগ্র সংগ্রাম করে। বাপি প্রথমটা একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল—বললে, 'লেখাপড়া শিখে ফল কি? আমি কারখানায় চাকরি করব। টাকা আমার চাই-ই। এমন ক'রে চলে না।'

বাপি তার প্রণয়নাট্যের কথা স্বাভাবিকভাবেই গোপন করেছিল কিন্তু

সতীশবাবু তাঁর প্রাপ্য সম্মানটার বদলে ছাত্র-শিষ্য-পুত্রের মঙ্গলটাকেই বড় ক'রে দেখলেন। তিনি নিজেই কথা পাড়লেন। বাপি প্রথম প্রথম এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা কিন্তু পরে যখন দেখলে গোপন করা বৃথা তখন উদ্ধতভাবেই স্বীকার করলে। কী হয়েছে তাতে? হ্যাঁ—ভাল সে বেসেছে। তুচ্ছ লেখাপড়া, তুচ্ছ উন্নতি। জীবন আরও বড়!

সতীশবাবু ছায়ার মত লেগে রইলেন। মুখে বুঝিয়ে বলেন, আর অনুসরণ করেন সর্ব্বদা। শুনতে শুনতে বাপি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাগ করে—সতীশবাবুর সম্পর্ক ত্যাগ করতে চায় কিন্তু যে কিছুতে ছাড়ে না, তাকে ছাড়বে কি ক'রে? সতীশবাবু অচিরাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিলেন অন্য সূত্র ধ'রে। সব টিউশ্যনিতে দু' মাস ছুটি নিলেন—দিনরাত অচিরাদের বাড়ীই পড়ে থাকেন। বাপি একেবারেই নিভৃত অবসর পায় না। প্রথম প্রথম সে ক্ষেপে উঠেছিল কিন্তু পরে হার মানতে বাধ্য হ'ল। দিনরাত কানে যা শোনা যায়—তা ক্রমে বিশ্বাসও হয়ে পড়ে।

বাপি অবশেষে সামলে নিলে নিজেকে।

বি-এস-সি'তে অনার্স নিয়ে প্রথম হ'ল বাপি। সায়েন্স কলেজে এম-এস-সি পড়তে গেল। সতীশবাবু খরচ কমাতে সে মেস ছেড়ে আরও অন্ধকার গলিতে সস্তার মেসে উঠে গেলেন। টিউশ্যনীর সংখ্যা বাড়ল। এমন কি যে শিক্ষা সংস্কারের জন্য তাঁর জীবন পণ তাও পেছনে পড়ে গেল তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে। বাপির উন্নতি ছাড়া অন্য কোন কথা নেই এখন।

কিন্তু প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল বাপি এম-এস-সি পাস করার পর। সতীশবাবু চেয়েছিলেন, সে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিক্। বাপি সে কথা কানেই

তুলল না, একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল। বললে, 'আপনাকে দেখেই আমার শিক্ষা হয়েছে মাস্টার মশাই। আর না।'

'কিন্তু আমার স্বপ্ন?'

'আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার স্বপ্ন সার্থক করব অন্যভাবে। যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন ক'রে আপনাকে নিজস্ব ইস্কুল ক'রে দেব একটা। সেখানে যা খুশী তাই করবেন—যেমন ক'রে খুশী পড়াবেন!'

এত সৌভাগ্য বিশ্বাস করতেও পারেন না—যদিচ লোভে চোখ জ্বলে।

'সে কি আর হবে রে!'

'দেখবেন হয় কিনা। এ আমি করবই।'

আরও বছর দুই রিসার্চ্চ করলে বাপি, তারপর মস্তবড় সরকারি চাকরি পেলে। এক মাসের মাইনে হাতে পেয়েই বাপির প্রথম কাজ হ'ল ভাল একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে সতীশবাবুর সেই অন্ধকার মেস থেকে তাঁকে উদ্ধার করা।

'এ কি রে, এ কি রে—ওরে ও পাগ্‌লা—'

'আগে ওখানে গিয়ে উঠি, শোনবার সময় ঢের পাবো।' জোর ক'রেই নিয়ে যায় বাপি।

'কতকালের শখ, মাস্টার মশাই, আপনি আর আমি এমনি থাকব—দুজনে মিলে পড়াশুনো করব, পড়াশুনোর গল্প করব—সেই স্বপ্ন দেখব। আপনাকে একটু ভাল ক'রে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করতে হবে। কী চেহারা হয়েছে বলুন ত!......'

বিধাতা কথাগুলো শুনে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।......

মাস পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হ'ল যে নিত্য জ্বর হচ্ছে

বাপির। ডাক্তার এলেন হাসতে হাসতে—পরীক্ষা ক'রে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। সতীশবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এতদিন কেউ লক্ষ্য করেন নি? আশ্চর্য্য! দুটো দিকই—'

আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন সতীশবাবু! বাপি অনুনয় ক'রে বললে, 'আমাকে কোন হাসপাতালে দিন। চেষ্টা করলে কি আর ফ্রি বেড পাওয়া যাবে না? আপনার কাছে কিছুতেই থাকব না। এই ত শরীর আপনার—যদি ছোঁয়াচ লাগে?'

সতীশবাবু বললেন, 'তুই আমার ছেলে হ'লে এ কথা বলতে পারতিস বাপি? তোকে কোথায় রেখে আমি নিশ্চিন্ত থাকব বল্ত?'

আবার টিউশ্যনীর সংখ্যা বাড়াতে হ'ল। পাঠ্য-পুস্তক লিখলেন, তার জন্য তদ্বিরও করতে হ'ল। অর্থ-পুস্তক লেখা, প্রুফ দেখা—কোন কাজই বাকি রইল না। শিক্ষার আদর্শ গেল তলিয়ে—দেশের সমস্ত ছেলের মঙ্গল যে ঐ একটি ছেলের মধ্যে সংহত হয়েছে।

বাঁচানো গেল না। যাবে না—তাও জানতেন—শুধু বৎসর-দেড়েক ধ'রে রাখলেন মাত্র। তারপর একদিন বাপি তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল।

সবাই ভেবেছিল এবার ভেঙ্গে পড়বেন সতীশবাবু কিন্তু অবাক হয়ে দেখলে যে, তবুও যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করলেন না তিনি—তেমনি চলতে লাগল তাঁর অবিরাম সংগ্রাম।

বন্ধু অজয়বাবু বললেন, 'সতীশ, আর ও ফ্ল্যাট কেন? মিছামিছি অত খরচ—'

সতীশবাবু জিভ কেটে বললেন, 'বাপরে! বাপি কত শখ ক'রে ঐ ফ্ল্যাটে আমাকে এনে তুলেছিল—ও ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথায় যাব!'

বৃদ্ধ ষোড়শীবাবু একদিন বললেন, 'এখন ত আপনি একা। এ ভূতের পরিশ্রম আর কেন?'

কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন সতীশবাবু, 'কী জানেন, বাপির বড় সাধ ছিল একটা ইস্কুল করার, যে ইস্কুলে আমাদের আদর্শমত পড়ানো হবে! কত পরামর্শ করেছি দু'জনে ব'সে—কত স্বপ্ন দেখেছি। সেই জন্যেই সে বিয়ে-থা করেনি—দুজনের রোজগারের টাকা জমিয়ে ইস্কুল করব এই ঠিক ছিল।...এখন ত সেটা আমাকেই করতে হবে। নইলে বাপি স্বর্গেও সুখ পাবে না!'

'আপনি একটা ইস্কুল করবেন—টাকা জমিয়ে?' অবিশ্বাসের সুর, বিস্ময়ের সুর ষোড়শীবাবুর কণ্ঠে।

'দেখি না। চেষ্টা ক'রে—দেখতে দোষ কি। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি, কোঽত্র দোষঃ।' বুঝলেন না। বাপির নামে ওটা ক'রে যাবো এই মনস্থ করেছি—তার স্মৃতি—'

ব্যস্তভাবে ছাতাটা বগলে চেপে চ'লে যান সতীশবাবু, এক মিনিটও তাঁর দাঁড়াবার অবসর নেই।

আজও চলেছে তাঁর সেই সংগ্রাম—অবিরামভাবে।

দাম্পত্য

ওদের সরু গলিটা যেখানে এসে চওড়া বড় রাস্তায় মিশেছে, সেই মোড়ে হঠাৎ সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে সাক্ষাৎ।

স্বামী বললে, 'এই যে সুচিত্রা।'

ক্ষীণ ক্লান্ত-কণ্ঠে স্ত্রী উত্তর দিল, 'ও, এই যে।'

ক্লান্তির কোন কারণ নেই। ঐ রকমই অভ্যস্ত। সুচিত্রা হাঁটে অবসন্ন ভাবে, কথা কয় যেন ক্লান্তির শেষ নেই। চোখের দৃষ্টিটা সুদ্ধ যেন প্রাণহীন, বিবর্ণ।

'কোথায় চললে?' বিপুল উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করে স্বামী। বিজয়ের স্বভাব ওর স্ত্রীর ঠিক বিপরীত। সে চলে ছুটে, কথা কয় জোরে জোরে এবং দ্রুত। জীবনের ওপর ওর অগাধ আস্থা। সে ছেলেবেলায় খেলা-ধূলোয় প্রথম হ'ত—আজও সন্ধ্যার পর কাজে যেতে যেতে আলো জ্বেলে ছেলেরা ব্যাডমিণ্টন খেলছে দেখলে কারুর হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিয়ে একটা 'গেম' খেলে নেয়। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করে—হাজার কাজ থাকলেও ওটি বন্ধ হয় না। ওর চলায় বলায় ভঙ্গিতে প্রাণশক্তি যেন উছলে ওঠে, আর তাইতে প্রকাশ পায় ওর অসাধারণ কর্ম্মশক্তি। বিজয় ওঠে ছটায় এবং শুতে যায় রাত এগারোটায়। তখনও বিছানায় শুয়ে পড়াশুনো চলে। সকালের কাগজটা যেটুকু বাকী থাকে পড়তে সেটুকু শেষ করে—তারপর মেডিক্যাল জার্নালগুলো। ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় প্রতিদিনই রাত

একটা বেজে যায়। তবু, এত অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়েও সে ক্লান্তি অনুভব করে না কিছুমাত্র।

এই দুটি বিপরীত স্বভাবের মানুষের মধ্যে প্রেম জমে ওঠবারই কথা। আর তা ত উঠেও ছিল।

সুচিত্রা বললে, 'যাচ্ছিলুম তোমার ওখানেই।'

'আরে! সে যে আমার সৌভাগ্য। ইস্—যদি ঘরে ব'সে থাকতুম!' কৌতুক ক'রে বলে বিজয়।

কিন্তু সে কৌতুকের তাপ সুচিত্রার ক্লান্তির বরফ গলাতে পারে না। মুখে ওর একটা হাসির রেখাও ফোটে না। বিজয়ের মনেই পড়েনা কবে ও সুচিত্রাকে হাস্তে দেখেছে। হাসলেও মড়ার মত হাসি ফোটে, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ।

সুচিত্রা চুপ ক'রেই রইল। বিজয় বললে, 'কিন্তু দেবী, হতভাগ্যের প্রতি এত করুণা কেন আগে তাই বলো। না কি তোমার সঙ্গে বাড়ীতেই ফিরে যাবো।'

'না না, এখানেই সেরে নিই। কতকগুলো খুচরো ব্যাপার আছে। দীপু-মঞ্জুর বিস্কুট ফুরিয়েছে, এবেলাই মনে ক'রে পাঠিয়ে দিও। আমার সেই টনিকটা। সাবান এক বাক্স। ওদের জামার ছিট কিছু কিনতে হবে, আমারও খুচরো খরচ আছে—অমনি ঐসঙ্গে একশ'টা টাকা দিও।'

'টাকাটা এখনই নিয়ে যাও। বাকী জিনিযগুলো আমি চারটের মধ্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'তাই দিও। ওরা ইস্কুল থেকে ফেরবার আগেই বিস্কুটটা দরকার।'

'নিশ্চয় দেব। আচ্ছা, কিন্তু একটা কথা—এবার যে দশ পাউণ্ডের টিন ছিল চিত্রা, এখনও ত এক সপ্তাহ—'

'ওটা কেনাই তোমার ফুলিশ হয়েছিল। এই বর্ষায় টিন খোলবার পর কি আর থাকে? মিইয়ে গেলে তোমার ছেলেমেয়েরা খায়না তা আমি কি করব। সে চাকর বাকররা খাচ্ছে। তাও তারা খেতে চাইছেনা, বলে এ যে একেবারে কাদার তাল হয়ে গেছে দিদিমণি—'

'অ', একটু যেন দমে-যাওয়া কণ্ঠস্বরে বলে বিজয়।

'হ্যাঁ—আর একটা কথা, সামনেই ত শীত। ওদের ছুটো উলের ফ্রক আর পুলওভার চাই—কিনবে না বুনে নেব?'

'বুন্‌তে পারবে? তোমার ত আবার চোখে স্ট্রেন্ হয়।'

'না, সময় ত আছে। একটু একটু ক'রেই না হয় বুন্‌ব—তাহ'লে উল কিনতে হবে।'

'ওটা তুমিই পছন্দ ক'রে কিনে নিও বরং।...এই নাও, একশো কুড়ি-টাকা ছিল আপাতত দিলুম।'

'আচ্ছা।' তেমনি উৎসাহহীন ভাবে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে ব্যাগে রাখলে সুচিত্রা। তারপর একটু ইতস্তত করতে লাগল। অর্থাৎ 'তবে আসি' এ কথাটা ও স্বামীর কাছ থেকে শুনতে পারলেই খুশি হয়।... এ কথাটা বলতে আজও যেন কেমন বাধে ওর।

কিন্তু বিজয়ের অত ব্যস্ততার মধ্যেও, এই মুহূর্তে যেন সমস্ত সময় স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে কোথায়। সে স্ত্রীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। সে চাহনিতে আজও পুরুষের অনন্ত কামনা। চোখের চাহনিতে যুগযুগান্তরের বহ্নি। উৎসুক, ব্যগ্র হয়ে আছে, স্ত্রীর কাছ থেকে—এমন কি প্রেমও নয়—এতটুকু

সহানুভূতি, একটুখানি আগ্রহ, একটু স্নেহের ভঙ্গীমাত্র আশা ক'রে। কী প্রচণ্ড দীনতা ওর সেই দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকার মধ্যে!

কয়েক মুহূর্ত্ত, তাই যেন কত যুগ স্বামীর কাছে।

বিজয়ই শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন করলে, 'তুমি ত বাড়ীর কতদূর কী হ'ল— জান্‌তে চাইলে না।'

'সে ত তুমি দেখছই।' তেমনি নিরুৎসাহ কণ্ঠে উত্তর দেয় সুচিত্রা।

'এধারে গাঁথুনি সব কম্‌প্লিট্‌। দোতলার ছাদটা আজ-কাল ঢালাই হবে। এখন আর তেতলায় হাত দেবনা মনে করছি। এধারে সব সেরে নিই। দেওয়ালে বালির কাজ, সিঁড়ি, মেঝে—দোর জানলা হাজারো কাজ বাকী। এ সব খুচরো কাজে বড্ড সময় নেয়। আমি যে মোটে সময় পাচ্ছিনা দাঁড়াতে, কনট্র্যাক্টর ব্যবসাদার, তার পঞ্চাশটা বাড়ী হচ্ছে, কাজ চললেই হ'ল, তার আর তাড়া কি? তবু আমি আশা করছি মাস-দুয়েকের মধ্যেই বসবাসযোগ্য ক'রে নেব সবটা। তুমি সিঁড়িতে মার্বল্‌ পছন্দ করো, সিঁড়ি আর তোমার ঘরের মেঝে সাদা পাথর দিয়ে দেবো ঠিক করেছি। তুমি কি বলো?'

তবুও সে বিবর্ণ চোখে বিদ্যুৎ খেলে না।

'যা ভাল বোঝ তুমি।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই যে সামনেই—একটা টায়ফয়েড কেস আছে। তুমি একাই যাবে, না পৌঁছে দিয়ে আসব?' কোথায় যেন একটু ঔৎসুক্য ওর

গলায়। এমন সময় আসে বৈকি জীবনে, যখন কেউ কাজের ক্ষতি করলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ হয়।

'না, না, এটুকু আমি চলেই যাচ্ছি। তোমায় আর সময় নষ্ট করতে হবে না।'

সুচিত্রা বাড়ীর পথ ধরে।

বিজয় তবু দাঁড়িয়ে থাকে কিছুকাল। দীর্ঘনিঃশ্বাস? না, সে সময় ওর নেই। কোথায় যেন 'কল' আছে, কী যেন রোগ—ইতিমধ্যেই সব ভুলে গেল। অতীশ বাবুদের বাড়ী ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি, তারক বাবুদের বাড়ী টায়ফয়েড? না, না, মনে পড়েছে—অতীশ বাবুদের বাড়ীই টায়ফয়েড।...কি হ'ল আজ ওর? সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেন এমন ক'রে?

অভ্যস্ত দ্রুতপদে অতীশ বাবুদের বাড়ীর পথ ধরে।

অথচ এই সুচিত্রাকে পাবার জন্য কী না করেছে বিজয়। সাধনা? সাধনা কেন, তপস্যাই বলা যেতে পারে।

কি দেখেছিল ওর ঐ ক্লান্ত চোখে? কী মোহের অঞ্জন লাগিয়েছিল ওর ঐ অবসন্ন ব'সে থাকার ভঙ্গী? নাকি, সেদিন কিছু বহ্নি ছিল ওর চোখে মুখে?

কে জানে। আজ আর মনেও পড়ে না।

ওরা সহপাঠী ছিল। একসঙ্গে আই-এস-সি, বি-এস-সি পাস ক'রে বিজয় গেল ডাক্তারী পড়তে, সুচিত্রা এম-এস-সি পাস ক'রে রিসার্চ করতে লাগল। দুজনেই ভাল ছাত্র। ইণ্টার-মিডিয়েটের তৃতীয় স্থান পেয়েছিল বিজয়, বি-এস-সিতে ফার্স্টক্লাস অনার্স। তারপর ডাক্তারীতে একবারও ফেল না

ক'রে গৌরবের সঙ্গে পাস করলে। আর সুচিত্রাও বি-এস-সিতে ফার্স্টক্লাস অনার্স নিয়ে এম-এস-সিতে প্রথম হ'ল।

এদের সহপাঠনা অবশ্য স্বল্পকালের কিন্তু বিজয়ের উৎসাহে পরিচয়টা সখ্যে পরিণত হ'তে বাধেনি। সুচিত্রার বাবা বিজয়কে স্নেহের চোখে দেখতেন। ওর উৎসাহী মন প্রৌঢ় বয়সেও তাঁকে যৌবনচঞ্চল ক'রে তুলত। সে যে ছাত্র হিসাবে ভাল তা তিনি সুচিত্রার মুখে শুনেছিলেন, সুতরাং তাকে সাদর অভ্যর্থনা করতে বাধেনি। সুচিত্রার মা ত বিজয়কে খুবই ভালবাসতেন, বলতেন, 'আমার ছেলেটা বেঁচে থাকলে অম্‌নিই হ'ত। কেমন দুটি ভাইবোনে পড়াশুনা করত, খুন্‌সুটি করত—হেসে খেলে বেড়াত। আমার কপাল—নইলে অমন ছেলে খেয়ে বসে থাকি! তবু বিজুটা আসে, আমি যেন অনেকটা শান্তি পাই।'

বিজয়ের দেশ মফস্বলে, হোস্টেলে থাকা ছাড়া তার উপায় ছিল না, সেজন্য সুচিত্রার মা প্রায়ই ওকে নিমন্ত্রণ করতেন। বিজয় যত খেত তার চেয়ে ঢের বেশী উচ্ছ্বাস করত—পিঠে পায়স হ'লে ত আর কথাই ছিলনা। বলত, 'মা, মাছ মাংস তবু দৈবাৎ ঠাকুরদের হাতে উৎরে যায় কিন্তু এসব ত আমাদের কাছে দুরাশা।'

চেয়ে চিন্তে উপদ্রব ক'রে খেত বিজয়, মার প্রাণও স্নেহ-বিগলিত হয়ে উঠ্‌ত। তিনি প্রায়ই সুচিত্রাকে বলতেন, 'ওরে, কলেজ থেকে একটা টেলিফোন ক'রে দিস ত বিজুকে, আজ যেন আসে একবার। নিশ্চয়ই মনে ক'রে করিস্‌, ভুলিসনি যেন।'

সুচিত্রা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ত, 'এই আবার এক হাঙ্গামা···এসব ভাল লাগেনা আমার—তোমাদের এই খাওয়া খাওয়া নিয়ে যেন এক আদিখ্যেতা!'

বিজয়কে বলত মার সামনেই, 'তুমিও এমন কাঙ্গালপনা করো খাবার নিয়ে, যেন মনে হয় কখনও কিছু খেতে পাওনি। আমার লজ্জা করে তোমার ভাবভঙ্গী দেখে—'

বিজয় কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না। হেসে বলত, 'তুমি আধুনিকা, আহারটা অত্যন্ত স্থূল বস্তু তোমাদের কাছে, কাজেই লজ্জার ব্যাপার। আমরা অত সূক্ষ্ম রসের রসিক নই, আমরা জানি যেটা না হ'লে এ সংসারে তুচ্ছ কীট-পতঙ্গেরও চলে না, যত বড় মনীষীই হোন্—কবি বলো, দার্শনিক বলো—সকলের সবকিছু পাণ্ডিত্য প্রতিভা অচল যেটার অভাবে, সেটা এমন কিছু অকিঞ্চিৎকর ব'লে ভাবতে পারিনা। পৃথিবীতে যদি কিছু আদিখ্যেতা করতেই হয়, খাদ্য নিয়ে করাই সঙ্গত নয় কি !'

'না। সে তুমিও জানো বিজু। শুধু ওটা তোমার পোজ্। মাকে খুশি করার একটা চাল ওটা।'

'কিন্তু সেটাও ত এই জন্যে। নইলে মার কাছে কি স্বার্থ বলো ?'

'জানিনে। বাজে বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে—'

ক্লান্ত সুচিত্রা চুপ করে। মা ধমক দেন, 'ওসব তোর কি কথা-বার্ত্তা রে ! তোরই যেন আদিখ্যেতা—না-খাওয়াটা একটা চাল তোমার।'

বিজয়ের দুর্ভাগ্য যে সুচিত্রার মা বেঁচে নেই। থাকলে বোধ হয় এমনটা হ'ত না।

ডাক্তারী পাস ক'রে যখন কোথায় বসবে এই প্রশ্ন দেখা দিল, তখন বিজয়ের বাবা বলেছিলেন সরকারী চাকরী নিতে, মা আর কাকারা উপদেশ দিয়েছিলেন দেশে গিয়ে বসতে।

কিন্তু কোন কথাই না শুনে বালিগঞ্জের এই পাড়ায় যে বিজয় এসে বসল, তার মূলেও এ বাড়ীর প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল বৈকি। সুচিত্রার বাবা সরকারী বড় অফিসার ছিলেন, সুতরাং রিটায়ার ক'রে নতুন বাড়ীতে এসে বসেছেন, সত্ত তাঁর নড়বার কোন আশঙ্কাই ছিলনা। সুতরাং বিজয় বেছে বেছে এই পাড়াতে ঘর নিয়ে ডিস্পেন্সারী সাজালে।

সুচিত্রা বলেছিল, 'সিলি! কী আছে এ পাড়াতে? এত জায়গা থাকতে এখানে এলে বিজু। তুমি একটি ফার্স্টক্লাস ক্যাবলা।'

বিজয় বলেছিল, 'কেন, এপাড়া ওপাড়ায় তফাৎ কি? যার শক্তি আছে সে সব জায়গাতেই পসার জমাতে পারবে। জানো ত সেই সঞ্জীব চাটুয্যের কথা—অশ্বত্থগাছ বড় রসিক! সে প্রস্তর হইতে রস আহরণ করে।'

'আ। বড় বিরক্ত বোধ হয় তোমার ঐ বড়-বড় কথাতে।'

বিজয়কে প্রস্তাবটা করতে হয়েছিল ভয়ে ভয়েই। বলা বাহুল্য, সুচিত্রা প্রথমে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, 'ওসব কথা থাক বিজু। ওসব সিলি ননসেন্স আর এ বয়সে শুনতে ভাল লাগেনা।'

বিজয় বলেছিল, 'ভালবাসাটা না হয় সিলি ননসেন্স—যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু বিয়ে করাটা ত তা নয়। তুমি বৈজ্ঞানিক, জৈব ধর্ম্মকে অস্বীকার করতে পারো না। আর বিয়েই যদি করতে হয় ত পাত্র হিসেবে আমি কি খারাপ?'

সুচিত্রা উত্তর দিয়েছিল, 'এমন ভালই বা কি। তোমার চেয়ে ভাল পাত্র কি আমি পেতে পারিনা? তিনবছর যোগ্যতার সঙ্গে রিসার্চ্চ ক'রে সরকারী চাকরীতে ঢুকেছি। চেহারাও বোধ হয় মন্দ নয়। সুতরাং—?'

সুচিত্রা হাসির মত ক'রে মুখটা বেঁকিয়েছিল একটু।

'সেই সব ভাল পাত্র ত আপাতত হাতের কাছে নেই। আমিই আছি। আমার সম্বন্ধে তোমার আপত্তি কি ?'

'তুমি ? তোমাকে ও লাইটে ভেবেই দেখিনি কোনদিন। ক্যাবলা ব'লে, কৃপার পাত্র ব'লেই মনে করেছি। তাছাড়া বয়সেও বোধহয় ছোট হবে তুমি, কে জানে !'

'ও সব তোমার বাজে ওজর সুচিত্রা। আমার কথাটা তোমায় ভেবে দেখতেই হবে।'

প্রতিদিনই এক কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে সুচিত্রা রাজী হয়েছিলো। ওর মা তখন আর বেঁচে নেই, সুচিত্রার বাবা খুশিই হলেন। নিজের মেয়ের চেয়ে তাঁর বিজয়ের ওপর আস্থা বেশী। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। সুচিত্রার ভবিষ্যৎ কিছুদিন ধরেই তাঁকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল।

কিন্তু বিজয়ের লড়াই ঐ খানেই থামেনি। ওর বাবা অনেক কষ্ট ক'রে ওকে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন, এমন কি কাকারাও কম স্বার্থ ত্যাগ করেন নি। ওঁদের মনে ব্যথা দিয়ে কোন কাজ করতে সে পারবে না। গোঁড়া হিন্দু পরিবার ওদের—এরকম বিবাহে ওঁরা অভ্যস্ত নন্।

বিজয়ের দিকে যুক্তি ছিল যে সে পাল্টি ঘরেই বিয়ে করছে। প্রথমত বয়স সম্বন্ধেই বাবার ঘোরতর আপত্তি। তিনি বললেন, 'জীবন তোমার সবে শুরু, কিন্তু ওদের এ বয়সে উৎসাহ কমে আসে। আটাশ বছরের পুরুষ আর আটাশ বছরের মেয়েতে ঢের তফাৎ। আরও একটা কথা কল্পনা করো, দশ বছর পরে তোমার যৌবন ঠিকই থাকবে, উদ্যম উৎসাহ কিছুরই অভাব থাকবেনা কিন্তু আটত্রিশ বছরের বাঙ্গালীর মেয়ের দেহে মনে কি থাকে বাবা ? আজ যেটাকে আকাঙ্ক্ষিত ধন ব'লে ভাবছ, কাল সেটাই

বিভীষিকা হয়ে উঠবে, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ থাকবে না। সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে চাপা সেই বৃদ্ধের মত তোমার সমস্ত শক্তিকে পঙ্গু ক'রে তুলবে। জানতো, সাঁড়াশীর মত পা দুটা দিয়ে গলা চেপে ধরতো— নিজের ইচ্ছামত জীবনের পথে চলতে গেলেই দম বন্ধ হয়ে আসত তার ?'

ইস্কুল মাস্টার বাপকে করুণার চোখে দেখত না বিজয় বরং শ্রদ্ধাই করত। কিন্তু সেদিন ওর চোখে ছিল রঙ্গীন চশমা। কোন কথাই ভাল লাগেনি। সে জেদ ক'রে মান অভিমান ক'রে মা বাবার কাছ থেকে মত আদায় করেছিল। অত্যন্ত অনিচ্ছাতে মত দিলেও তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে তাঁরা রাজীই ছিলেন। অর্থাৎ বিবাহ দেওয়ানো কথাবার্ত্তা কওয়া সব কিছু। অন্তরের হতাশা বাইরে না বেরোয়, এটা ছিল তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য।

কিন্তু সুচিত্রার তাতেও আপত্তি। বলেছিল, 'আমি কিন্তু ও দেশে ফেশে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারব না, ফুলশয্যা তার পরের দিন, ব্যস্। আট দিন থাকা পোষাবেনা।'

'কিন্তু অষ্টমঙ্গলা না সেরে এলে মা মনে বড় দুঃখ পাবেন।'

'যা হয় একটা বানিয়ে ব'লো, না হয় ব'লো বাবার খুব অসুখ বা অমনি কিছু।'

শেষ অবধি আটদিন ছিল অবশ্য। দেশের ওঁরা এত যত্ন করেছিলেন যে মুখের ওপর আঘাত দিয়ে চ'লে আসতে সুচিত্রারও বেধেছিল, কিন্তু আর কখনও সে দেশে যায়নি।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। দুটি সন্তান হয়েছে ওর, দীপক আর মঞ্জু। বিজয়ের পশার বেড়েছে দ্রুত গতিতে—ও ভাল ডাক্তার ব'লে হয়ত নয়—অত্যন্ত পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ এবং মিষ্টভাষী লোক ব'লে। পাড়াঘরে টাকা পয়সা বাকীই থাকে দু'চারটে। বিজয় তার প্রতিবেশী ডাক্তারের মত ঘাড়ে চেপে আদায় করে না—সেজন্য দুপয়সা দাম বেশী দিতেও আপত্তি নেই। এতে ক'রে বিজয় দেখেছে যোগবিয়োগের কাঁটায় লাভের ওজনই ঝুঁকে থাকে।

কিন্তু এ ত গেল জীবনের বহিরঙ্গ। ভেতরে ভেতরে এই উৎসাহী লোকটি সত্যিই আজ ক্লান্ত।

ডিস্‌পেনসারীর ওপর ওর একটা বাসা ছিল, একখানা ঘর এবং চাকর। সেখানে সুচিত্রাকে তোলবার কথা বিজয় মুখে আনতেও পারলে না। অতএব সে বাপের বাড়ীতেই রইল। তাই ব'লে বিজয়ের সেখানে থাকবার হুকুম ছিল না। সুচিত্রা মুখ বেঁকিয়ে বলত, 'এ কী ঘরজামাই? ছি!'

সপ্তাহে একদিন মাত্র থাকা চল্‌ত। বাকী ছ'দিনের ব্যবস্থা বিচিত্র। যেদিন রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরতে পারত সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ত—কাজের চাপে যেদিন ফেরা অসম্ভব হ'ত সেদিন দেখাও হ'ত না। শ্বশুর জোর ক'রে রাত্রে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থাটা করেছিলেন। সুচিত্রার কড়া হুকুমে ঠাকুর চাকরকেও বসিয়ে রাখা চলত না। দশটার মধ্যে এলে ঠাকুর খাবার দিয়ে যেত, সুচিত্রা সামনে এসে বসত, কোন কোনদিন শ্বশুরও থাকতেন। তা নইলে দেখ্‌ত নিচের টেবিলে খাবার ঢাকা আছে, কোন কোন দিন বিড়াল কিছু নষ্টও ক'রে যেত। পিঁপড়ে ধরা ত তুচ্ছ ঘটনা।

বিজয় বলত, 'বাসা একটা দেখি চিত্রা। এমন ক'রে কি চলে?'

সুচিত্রা বলত, 'বাবার কি করব। বৃদ্ধ বয়সে একা—'

বিজয় বলত, 'তাহ'লে বড় বাসা নিই। বাবাও চলুন।'

'জামাই-বাড়ী? ছি!'

শ্বশুর নিজে বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'এ তোর কী বিশ্রী জেদ সু। এত বড় বাড়ী আমার পড়ে রয়েছে—জামাই কেন কষ্ট করবেন। ওঁরই ত সব।'

'কেন বাবা? তুমি কোন চ্যারিটিতেও ত দিতে পার। ওসব কথা শুনিও না ওঁকে, তাহ'লে উপার্জ্জনের আর্জ কমে যাবে।'

বাবা উত্তর দিতেন, 'তুই ওর বৌ হ'তে পারিস কিন্তু তোর চেয়ে ওঁকে ঢের বেশি চিনেছি আমি। তোর সঙ্গে বিয়ে হয়েও যদি আর্জ না কমে থাকে ত সে আর কমবে না।'

শ্বশুর একদিন দুপুরবেলা জামাইয়ের বাসায় গিয়েছিলেন। দেখলেন, আড়াইটের সময় জামাই ফিরে, স্নানের জল না পেয়ে নিজে টিউব ওয়েল থেকে জল পাম্প ক'রে এনে স্নান করলে, তারপর ঢাকা খুলে ভাত খেতে বসল। ঠাণ্ডা শক্ত ভাত, একটা কি ঘ্যাঁট্ এবং দু' টুক্‌রো মাছ। খাবার জলটাও নিজেকে গড়িয়ে নিতে হ'ল। আনাড়ী চাকর তায় ফাঁকিবাজ, প্রত্যহই নাকি এমনি বেরিয়ে যায় দুপুরে।

শ্বশুর প্রশ্ন করলেন, 'সকালে কি খেয়ে বেরোও?'

'এর আগের চাকর লুচি কি ডিম ভাজাটাজা ক'রে দিত। এ এত পারেনা। গোটা চারেক রসগোল্লা, দুটো কলা আর চা—'

শ্বশুরের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'তুমি বাসা

দেখ বাবা। মেয়ে আর আমি পুষ্‌তে পারব না। সেই কথাই বলতে এসেছিলুম।'

মেয়ে শুনে বললে, 'ওটা বাবার একটা জেস্‌চার। স্বার্থত্যাগ। হাউএভার—তুমি বাসা ছাখো। কিন্তু আমাকে না দেখিয়ে নিও না—'

একে যুদ্ধের ফলে বাসা দুষ্প্রাপ্য, তায় যদি বা ডাক্তারীর দৌলতে কোনটা খুঁজে বার করে বিজয়, সুচিত্রার একটাও পছন্দ হয় না। ইতিমধ্যে সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে সে কথা চাপা পড়ে গেল।···

প্রথম পুত্রসন্তান হওয়ার পরেও যখন বিজয় বৌকে নিয়ে গেল না দেশে, তখন বুড়োবুড়ী আর থাকতে পারলেন না। দেশ থেকে এসে হাজির হ'লেন। তাঁরা এ গৃহস্থালীর কোন কথাই জানতেন না—অবাক হয়ে গেলেন।

মা নাতিকে দেখ্‌তে গিয়ে পুত্রবধূর দুই হাত ধ'রে বললেন, 'এমন ক'রে ওকে দগ্ধে মেরোনা মা, প্রসন্ন হও। ওরও ত সমাজ আছে—লোকের কাছে কি বলে ভাবো দিকি, তিন বছর বিয়ে হয়েছে। বৌ আজও স্বামীর ঘর করে না!'

ক্লান্ত সুচিত্রা স্বামীকে ডেকে বললে, 'এই সব নানা রকম কথা শুনতে আমার ভাল লাগেনা ব'লেই আমি তোমাদের দেশে যাইনা। বিয়ে করার এত ঝঞ্ঝাট জানলে আমি কখনই রাজী হতুম না। যাই হোক্, এসব আর ভাল লাগে না। বাসা নাও যেখানে পাও—'

মার আগ্রহে দেশেও যেতে হ'ল। সেখানে অন্নপ্রাশন করবেন ছেলের। 'এটি আমায় ভিক্ষা দাও মা। দেশে যে আর মুখ দেখাতে পারছি না।' ঠিক দুটি দিন থেকে সুচিত্রা ফিরে এল!

'এনাফ্ অব দিস্ ননসেন্স্। জানো, এবার ভাবছি আবার চাকরি করব।'

'কেন চিত্রা ?' ব্যস্ত হয়ে বিজয় প্রশ্ন করে।

'অফিসের অজুহাত একটা বড় অজুহাত ত। কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

বিয়ের পরই—স্বামীর ঘর না করুক, চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সুচিত্রা।

দুটি বড় ঘর-ওলা ফ্ল্যাট্ পেয়ে বিজয় একেবারে টাকা আগাম দিয়ে এল। ফার্ণিচার শ্বশুর দিলেন কিছু কিছু। বললেন, 'এ তোমার জন্যই কেনা, বাবা বিজু। এ আনন্দের দিনটির জন্য অনেক দিন ধ'রেই স্তুত হচ্ছি।'

অস্ফুটস্বরে সুচিত্রা বললে, 'সকলেরই যেন বাড়াবাড়ি। ভাল লাগে না এ সব আমার।'

তা ছাড়াও বিজয় কত যে বাজার করলে তার ইয়ত্তা নেই। কাজ কামাই ক'রে সাজালে সব। ওবাড়ী থেকে সুচিত্রার মাল এসে পৌঁছল এক গাদা। বিছানা, ছেলের কট্ ইত্যাদি—সে সবই বিজয় গুছিয়ে রাখলে।

সন্ধ্যার পর খেয়ে দেয়ে সুচিত্রা এল।

এক ঘরেই দুটি খাট রাখা হয়েছে। মধ্যে খোকার কট্।

'এ কী ? এক ঘরে কেন ? তোমাকে হাজার বার বলেছি না। এসব ননসেন্স আমার কাছে চলবে না। তুমি ডাক্তার হয়ে—। বিয়ে হয়েছে ব'লেই এক ঘরে শুতে হবে, এ আইডিয়া একেবারে প্রি-হিস্টোরিক।··· প্লিজ, অন্য ব্যবস্থা করো।'

বিজয়ের মুখ শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে, 'কিন্তু সু, লক্ষ্মীটি, দুটি ত ঘর, তার মধ্যে ওটা একেবারে মালে বোঝাই হয়ে গেছে। তবুত আমার আগের ঘরটা ছাড়িনি, সেটাতেও কতক চালান করেছি। তা ছাড়া চাকর শোবে—'

'চাকর চলনে শোবে 'খন। মাল ওঘরে আরও পাঠাও, এ ঘরে এনে রাখো। নইলে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও বাবার ওখানে। এ সব আন্-হাইজিনিক্—'

'আজকের মত শোও চিত্রা। সারা দিন এইসব ক'রে ক্লান্ত। এত রাত্রে আবার সব ওলট পালট করতে গেলে মরে যাবো। কালই আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো।' অনুনয় করে বিজয়।

বেশি বাদানুবাদে ক্লান্তি আসে সুচিত্রার—তাই রাজী হয়। কিন্তু পরের দিনই সকালে ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করতে হ'ল। চাকর মুখ টিপে হাসলে, অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করলে—কারণ এতটা বিজ্ঞানে দখল নেই তাদের।

অবশ্য বাসা ক'রেও খুব সুবিধা হ'ল না বিজয়ের। সকালের জল-খাবারের ব্যবস্থা ত দুরাশা। দুপুরে জলও গড়িয়ে নিতে হয়, আজও বেড়ালে মাছ খেয়ে যায়। উপরন্তু সংসারের হাজার ঝঞ্ঝাট এসে ঘাড়ে চাপে। ছেলের ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীর পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই। তাও অর্দ্ধেক দিন সে ওবাড়ী থেকে ফেরে না। ছেলের জন্য ঝি রাখতে হয়েছে। অত ঝামেলা সুচিত্রার সহ্য হয় না।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল। সুচিত্রা এই সুযোগে কিছু-কালের মত বাপের বাড়ী চলে গেল। বিজয়ের কিন্তু খুব ফাঁকা লাগল না।

বরং কয়েকদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বাধীনতার মূল্য আছে বৈকি। শেকল সোনার হ'লেও সহ্য হয় না, ওর পায়ে যা চেপে বসেছিল তা ত লোহার বেড়ী।

কিন্তু প্রথম সন্তান ওর—তার জন্য মন কেমন করে। বিজয় সময়ের হিসেব করতে শুরু করে অবশেষে—এখনও তিন মাস ছেলে হ'তে—তার পর ধরো আরও তিন মাস—মোট ছ'মাস এখনও দেরি—

ছ'মাস সত্যিই এমন কিছু বেশি সময় নয়। তিনমাস যখন বয়স হ'ল মঞ্জুর—অনেক ইতস্তত ক'রে বিজয় কথাটা পাড়লে, 'এবার ত একটা দিন টিন দেখ্‌তে হয় তা'হলে।'

ব'সে ব'সে উল বুনছিল স্থচিত্রা। ক্লান্তভাবে ঘাড় ঘোরাল, 'কিসের ?'

'ওখানে যাওয়ার—মানে বাসায় ?'

'ও।··· স্থ্যাখো, তোমার ঐটুকু বাসায় গুচ্চের মালের মধ্যে আমার বড় অস্থবিধা হয়। এখন আবার তুটো বাচ্ছা হ'ল—। তাছাড়া গোলমাল, চেঁচামিচি, ফ্ল্যাটবাড়ীর নানা আন্‌প্লেজাণ্টনেস ও আর আমার বরদাস্ত হয় না। তুমি বরং যেমন আছো তেমনি আর কিছুদিন থাকো—একটা বড় বাড়ীটাড়ী পেলে তখন দেখা যাবে।'

স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে বিজয়। কতক্ষণ পরে বলে, স্খলিত ভগ্ন শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, 'তুমি ওখানে যাবেনা মোটে ?'

এমনই দীনতা ও হতাশা ফোটে ওর গলায় যে স্থচিত্রা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়, 'তুমি একটা জমি কিনেছ, না ? সেও ত শুনেছি এই পাড়ায়—বাড়ী করবে কবে ?'

এত দুঃখেও বিজয়ের হাসি পেল, স্বামীকে করবার মত প্রশ্নই বটে।

এই বোধ হয় প্রথম—সে একটু তিক্ত-কণ্ঠেই বললে, 'শুনেছি !! ...তোমাকে বহুবার দেখাতে চেয়েছি, দেখোনি। প্ল্যান দেখিয়েছি, রাস্তার নামও জানো—ওভাবে প্রশ্ন করা কি তোমার সাজে ? আমার আর্থিক অবস্থা কি, তাওত জানতে চাওনি। তা'হলে আর ও প্রশ্নটা করতে না। ছ' বছরের প্র্যাক্‌টিসে সতেরো হাজার টাকা দিয়ে জমি কিনেছি তাই ঢের !'

সুচিত্রা চুপ ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর বলে, 'আমাকে ত তুমি দীর্ঘকাল দেখেই বিয়ে করেছ বিজু—আমার কাছ থেকে কি আশা করতে পারো তা জানবার সুযোগ তোমার হয়েছে। এ সব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না, পারিনে আমি গৃহস্থালীর অত ডিটেল্‌স্‌-এ যেতে।'

বিজয় চুপ ক'রে গেল। কিন্তু ওর ভেতরে যে উৎসাহের অফুরন্ত উৎস আছে তা সমস্ত আঘাতের ক্ষতই পুরিয়ে দেয় নিমেষে। পরের দিনই এসে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি সু। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি একটা, বিশ হাজার টাকা পাচ্ছি। বাকি টাকা এদিক ওদিক থেকে তুলে ফেল্‌ব ঠিক। দোতলা বাড়ী। একটা ঘর থাকবে আঠারো বাই পনের—সেইটে হবে তোমার ঘর। তুমি স্পেস্‌ ভালবাসো—ঢের স্পেস্‌ পাবে। আর একদিকে থাকবে আমার ঘর, আর এক দিকে নার্সারী, মানে ছেলেমেয়েদের ঘর। মধ্যে দরজা থাকবে কমিউনিকেটিং দোর। এ ছাড়া আর একটা ছোট ঘর, আমার স্টাডি। নিচে ঐ বড় ঘরটায় আমার চেম্বার—ডিস্পেন্সারী। বাকী একটাতে গুদোম, একটায় ল্যাবরেটরী—কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল কাজও করব মনে করছি—আর একটা থাকবে স্পেয়ার বেড্‌রুম। মানে বাড়তি ঘর—যদি কেউ আসে টাসে। ধরো মা-ই এলেন—।'

ওর উৎসাহের প্রবল স্রোত কিসে যেন আটকে গেল। সুচিত্রার ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল বিজয়। সুচিত্রা চোখ বুজে ব'সে ছিল হেলান কেদারাটায়, এবার চোখ খুলে বললে, 'ছাখো, তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। আমি একটা চাকরী নিয়েছি, কাল থেকে জয়েন করব।'

অনেকক্ষণ সময় লাগল কথা কইতে বিজয়ের, 'চাকরী নিয়েছ? কী চাকরী? কোথায়? অধ্যাপনা?'

'না। অত বকুনি আমার পোযায় না। কতকগুলি বোকা মেয়ের কাছে চেঁচানো। না, কেমিস্টের চাকরী। এতে আমার রিসার্চ্চ করার সুবিধাও থাক্‌বে। সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাজ—আটশ টাকার মত পাবো এখন সব সুদ্ধ।···দুপুরটা ত ব'সেই থাকি—তাছাড়া ঘরসংসার ঠিক আমার পোষায় না। বরং এদিক দিয়ে তোমায় যদি সাহায্য করতে পারি সেটাও কম কথা নয়।···ছেলেমেয়েদের ভাল ক'রে মানুষ করতে হবে ত, হিউজ এক্‌স্‌পেন্‌স্‌।'

'বাবাকে বলেছ?' শুধু প্রশ্ন করে বিজয়।

'বলেছি। বাবা ওল্‌ড্‌ ফ্যাসান্‌ড্‌ লোক। কেবল ঐ এক কথা, বিজুকে একটু ছাখ, ঘরকন্নায় মন দে,—বলেন আমার কাছে গিয়েই থাকবেন, এ বাড়ী ভাড়া দিয়ে।'

'বেশত, থাউজ্যাণ্ড ওয়েলকাম! দোতলার স্টাডিটা বলো ত—শোবার ঘর ক'রে নিই।'

'পাগল হয়েছ? এ বাড়ী থেকে গেলে বাবা আর বাঁচবেন না। আর তা ছাড়া জামাই-বাড়ী গিয়ে থাকবেন কি?'

বিজয়ের মুখে বহুবারই কথাটা এল যে, এ আপত্তিটাও ওল্ড ফ্যাশান্ড্। অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কার এসব। কিন্তু কিছু বললে না। সুচিত্রার এসব দিকে আত্মসম্মান-বোধ অসাধারণ, তার একটি পয়সার দরকার হ'লেও সে বিজয়ের কাছে চেয়ে পাঠায়। বাবার কাছে কোন কারণেই কিছু নেয় না। মাসে প্রায় পাঁচশ টাকা লাগে এ বাড়ীতেই—

ক্রমশ বিজয়ও ক্লান্ত হয়ে আসছে। সে আর কথা কইলে না, উঠে পড়ল।

সে হ'ল আজ দু' মাসের কথা। এই কটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করেছে বিজয়। কাজ আজকাল কিছুই ছাড়ে না, টাকার দরকার। পাড়ায় প্র্যাক্টিস—বরং গাড়ী একটা হ'লে মর্য্যাদা বাড়ে, কিন্তু গাড়ী কেনবার সাহস নেই। সব পয়সা যাচ্ছে বাড়ীতে। ভূতের মত ঘোরে দিনরাত। তারই ফাঁকে ফাঁকে নতুন বাড়ীটার কাজ দেখে, কনট্রাক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে, ছোটখাটো নির্দ্দেশ দেয়।

এর ভেতর সুচিত্রার কাছে যাওয়াও হয়নি। সে এসেছিল দিন-দুই, কয়েক মিনিটের জন্য। আফিস যাবার আগে বা পরে। নইলে লোক পাঠায় জিনিষের ফর্দ্দ দিয়ে আর টাকার প্রয়োজন জানিয়ে। এছাড়া কেউ কারুর খবর রাখে না।

কিন্তু আজকের এই সাক্ষাৎটা বিজয়কে যেন আমূল নাড়া দিয়ে গেল।

কোথায় কী গোলমাল হ'ল, মস্তিষ্কের কোন্ স্নায়ুতে কি আঘাত করল—সারাদিন উন্মনা হয়ে বেড়াল বিজয়। অনেক রোগীকে ভুল ওষধ দিল, অনেকের কাছে যেতেই মনে রইল না। টাকা-কড়ির হিসাব গুলিয়ে যেতে লাগল বার বার।

অবশেষে মনের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে সুচিত্রার আজকের এই নিস্পৃহতায় ওর একটা সন্দেহ জেগেছে। সে সংশয়ের কথাটা মনে আনতেও সাহসে কুলোচ্ছে না ওর।

তবে কি সুচিত্রা নতুন বাড়ীতেও আসবে না? কিন্তু কেন? কেন?

কোন উত্তর পায় না। সন্ধ্যার পর 'শরীর খারাপ' সংক্ষেপে এই কথা মাত্র জানিয়ে চেম্বার থেকে উঠে পড়ে। অনেকদিন পর নিজে থেকে একটা বাজে খরচ করে—একটা ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে যায় মাঠে, সেখানে অন্ধকারে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত জোরেজোরে হাঁটে পাগলের মত। তারপর ফিরে পাঁজীটা খুলে বসে। পরের দিন কন্‌ট্রাক্টরকে গিয়ে বলে, 'কত বেশি টাকা দিলে আপনি দোতলাটা কুড়ি দিনের মধ্যে বসবাসযোগ্য ক'রে দিতে পারেন?'

'সে কি? কুড়ি দিন? অসম্ভব।'

'অসম্ভব ব'লে শব্দ বিংশ শতাব্দীতে নেই সত্যেন বাবু। সারারাত কাজ করান, আমি তিনগুণ রোজ দেব।'

'দেবেন?'

'দেব কিন্তু কুড়ি দিন। মনে থাকে যেন। এক বেলা দেরী হ'লে আপনাকে সব টাকা রিফ্যাণ্ড করতে হবে।'

'বেশ! কিন্তু সুপারভিশ্যান্ চার্জ্জ লাগবে হাজার টাকা এক্‌স্‌ট্রা।'

'তাই হবে।'

সেদিন রাত্রে সুচিত্রার কাছে গেল বিজয়।

'সব ঠিক ক'রে ফেললাম সু?'

'ঠিক?' একদিকের ভ্রূ ঈষৎ তুলে প্রশ্ন করে সুচিত্রা।

'হ্যাঁ। ৩১শে শ্রাবণ গৃহপ্রবেশের শেষ দিন। তারপর একমাস আর

দিন নেই। তিনগুণ টাকা দিয়ে ঠিকেদারকে রাজী করিয়েছি। তারই মধ্যে দোতলাটা ফিনিশ ক'রে দেবে। মাকেও চিঠি লিখে দিয়েছি—তিনি চলে আসবেন।'

'বিশে শ্রাবণ? ইংরেজী যেন কত হ'ল? চৌঠো আগস্ট?... ও। ভালই হ'ল মাকে চিঠি দিয়েছ। উনি এসে গেলেই ঠিক হবে। ওদিন আমি কিন্তু যেতে পারব না।'

'তুমি—যেতে—পারবে না? তার মানে?' কথা বেধে যায় বিজয়ের, যদিও গত ছত্রিশ ঘণ্টা এই আশঙ্কাই করছিল সে।

'মানে আমাকে দিল্লী যেতে হবে ঐ সময়টায়। ডিপার্টমেণ্টে গোলমাল হচ্ছে—ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বস্-এর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। তাতে কি—মা আসবেন, আমার বাবা আছেন, ঠিক ক'রে নিতে পারবে না?'

'না। সে কিছু আটকাবে না।' কেমন একটা শুষ্ককণ্ঠে কথাগুলো ব'লে উঠে দাঁড়ায় বিজয়, 'মা আসছেন, তোমার বাবা আছেন—ঠিকইত! কীই বা গৃহপ্রবেশ। তোমার কাজের ক্ষতি করার দরকার নেই।'

'তুমি চললে নাকি? খেয়ে যাবে না? বাবা যেন ঠাকুরকে তোমার খাবার কথা বলছিলেন!' নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুচিত্রা।

'তোমার বাবা এখনও বড্ড ওল্ড্ ফ্যাশন্ড্ রয়ে গেলেন সু। এখনও সেই জামাই এলে খাওয়ারার কুসংস্কার গেল না।... সরি টু ডিস্‌আপয়েণ্ট দি ওল্ড্ বয়—কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে। এখনই একবার সত্যেনের কাছে যেতে হবে।' হঠাৎ হেসে ওঠে বিজয়।

'কে সত্যেন?'

'ও এমন কেউ না। কনট্রাক্টর।'

সত্যেনের কাছে পৌঁছে বিজয় আবার হেসে ওঠে আপন মনে।

'কী হ'ল, হাসছেন যে ?'

'না, কিছু না। দেখুন তাড়া করবার আর দরকার নেই। ভেবে দেখলুম মিছিমিছি অতগুলো টাকা বেশি খরচ করার প্রয়োজন নেই। যেমন চল্‌ছে তেমনি চলুক।'

'তাই ভাল। আমিও বাঁচলুম।' সত্যেন বাবু ঝুঁকিটা নিয়ে অবধি অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

'হ্যাঁ, আর শুনুন। সেদিন যে নীচের তলা ভাড়া দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাড়াটে আছে ?'

'আছে বৈকি ! দেবেন ?'

'সবটা নেবে ?'

'তা নিতে পারে হয়ত। কিন্তু আপনি দেবেন কেন ?'

'বেশি ভাড়া পাবো। আমার ও ফ্ল্যাটে আর ডিস্‌পেনসারীতে লাগছে মোটে একশ'র মত। এতে ত দুশো আড়াইশো পাবো ?'

'বে-ওজর। হাজার কয়েক টাকা য়্যাডভান্সও দেওয়াতে পারি।'

'খুব ভাল। পাকা কথা দিলুম। ভাড়াটে দেখুন আপনি।'

বিজয় সেখান থেকে হেঁটেই বাসায় ফিরল, অনেকদিন পরে শীষ্ দিতে দিতে।

মিছে কথা

সত্য কথা বলার কোন বাধা ছিল না, তবু মিছে কথাই শেষ পর্য্যন্ত বলতে হ'ল বইকি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হ'ল বোধ হয় মিছে কথার। স্ত্রীরা বলেন এবং স্বামীদের বলতে বাধ্য করান। ক্রমশ মিছে কথা বলাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

আসলে উমা সম্বন্ধে অজিতের কোন দুর্ব্বলতাই ছিল না। নিচের তলার ঘর দুটো যখন অজিতের মা ভাড়া দেওয়া স্থির করেন, সেই সময় প্রথমেই ভাড়া এলেন মণিবাবু—উমার বাবা। মণিবাবু কোন্ ব্যাঙ্কে যেন কাজ করেন, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, নেহাতই ছাপোষা লোক। আফিসের ফেরত আর একটা দোকানেও বুঝি খাতা লিখতে হয়। নইলে এ দুটো ঘরের ভাড়া দেওয়াও সম্ভব হ'ত না।

উমা ওঁরই বড় মেয়ে, পনেরো-ষোল বছরের হাসিখুশি মেয়েটি। ভাইবোনদের সামলানো, মার রান্নার যোগাড় দেওয়া, বাপের ফাইফরমাশ, জল তোলা, বিছানা পাতা, ছত্রিশ বার চা করা, ইত্যাদি কাজে দিনে-রাতে বোধ হয় নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় থাকে না; তবু যে কোথা থেকে সে এত হাসির খোরাক পায় তা কেউ বুঝতেই পারে না। দিনরাত হাসে এবং হাসায়। ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া যেন ওর মুখে কথাই নেই। দেখতে যে খুব সুশ্রী তা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ-চোখের গঠনও চলনসই মাত্র। অজিত যে ওকে এত স্নেহের চোখে দেখত তার প্রথম কারণ, ওর অন্তরের ওই অফুরন্ত

আনন্দের উৎস—যে আনন্দের নেশা কাছাকাছি যত লোক থাকে সকলকে মাতিয়ে তোলে। উমা দুদিনেই অজিতের মাকে বশ ক'রে নিয়ে ওপর-তলায় নিজের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে এবং অজিতকে "দাদা" ব'লে আবদারে অত্যাচারে অভিভূত ক'রে তুললে। অজিতের নিজের বোন ছিল না, এই মেয়েটিকে পেয়ে তার সেই অভাবটা যেন ঘুচল। সে প্রসন্ন মনেই ওর সমস্ত আব্দার ও তামাসার অত্যাচার সইত।

তা ছাড়া, উমার স্বভাব—সে কাজ না ক'রে থাকতে পারত না। অজিতের জামার বোতাম আগে কিছুতেই ঠিক থাকত না, বেরোবার সময় চেঁচামেচি ছিল নিত্যকার ঘটনা, উমা ধোপার বাড়ি থেকে কাপড় এলেই নিজে গিয়ে সবগুলো জামার বোতাম দেখে সেলাই ক'রে দিয়ে আসতে সুরু করলে। আগে অসময়ে চা চাইলে ইন্দিরার বিরক্তি সহ্য করতে হ'ত, উমা ইঙ্গিতমাত্র চা ক'রে নিয়ে আসে নিচে থেকে। দু-চার দিন পরে ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন রইল না, কোন্ অসময়ে অজিত চা পেলে খুশি হয় সেটা ওর মুখস্থ হয়ে গেল। আরও দু-চার দিন পরে জুতোয় কালি দেওয়া, জামা-কাপড় গুছিয়ে তুলে রাখা, ঘর-দোর ঝাড়া-মোছার কাজও উমা ইন্দিরার হাত থেকে কখন্ কি ক'রে নিজের হাতে টেনে নিলে তা ইন্দিরাও বুঝতে পারলে না।

নিজের কাজ অপরে ক'রে দিলে খুশি হবার কথা, কিন্তু মনের এমন কুটিল গতি, ইন্দিরা ক্রমশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল। সে অপ্রসন্নতা চাপা রইল না। এমন রূঢ় হয়ে উঠল তার প্রকাশ যে, অজিত ব্যাকুল হয়ে বার বার ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, উমার প্রতি তার স্নেহ নিতান্তই ভগ্নীর প্রতি দাদার স্নেহ। কিন্তু অজিত যত ব্যস্ত হয়, ইন্দিরা ততই ভুল

বোঝে। শেষে অশান্তি এতই প্রবল ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, উভয় পরিবারে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রইল না। এর পরে আর বিস্তারিত বিবরণে যাবার প্রয়োজন নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, মণিবাবু অন্য বাসা দেখে উঠে যেতে বাধ্য হলেন।

এতে ইন্দিরা নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু উমাদের সঙ্গে অজিতের সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল না। ঠিকানা উমাই দিয়েছিল, আফিসের ফেরত অজিত মধ্যে মধ্যে ওদের বাসায় যেত এবং উমার সঙ্গে হাসি-তামাসা ক'রে চা-জলখাবার খেয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন তৃপ্ত মনে বাড়ী ফেরার পথে দেরি হওয়ার নিত্য নূতন কৈফিয়ৎ উদ্ভাবন করত। এই ভাবেই গত তিন-চার বছর চলছে, বোধ হয় সেইজন্যই অজিতের সতর্কতা একটু শিথিল হয়ে এসেছিল, নইলে এমন 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হবে কেন?

কথাটা তা হ'লে খুলেই বলি।

এখানে থাকতেই ভাইফোঁটায় উমাকে একখানা শাড়ি দিয়েছিল অজিত। তারপর থেকে না-দেওয়ার কথা আর ওঠে না। আফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে ভাইফোঁটার ভোজটা খেয়ে যায় এবং কাপড়খানা দিয়ে যায় সে। এর ফলে এতকাল নির্ব্বিঘ্নে সন্দেহটা এড়ানো গেছে। কিন্তু হঠাৎ এবার ফোঁটার দিন থাকাতে উমা জেদ করলে, সকালে এসে ফোঁটা নিয়ে যেতে হবে। ঠিক হ'ল যে, ভোরবেলা বাজার করার সময় এক ফাঁকে বাসএ ক'রে এসে অজিত ফোঁটা নিয়ে যাবে, শালাদের জন্য ভাল ক'রে বাজার করার অজুহাতে কিছু দেরি হ'লেও ক্ষতি হবে না।

মুশকিল হ'ল এই যে, কাপড়টা তা হ'লে সকালেই দেওয়া দরকার।

অনেক ভেবে-চিন্তে শাড়িখানা আগের দিন কিনে ওর আফিসের কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার পোর্টফোলিও ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললে। এক-একদিন এ ব্যাগে যথেষ্ট কাগজ থাকে, ইন্দিরা সন্দেহ করবে না। সে এ ব্যাগ কোনদিন খোলেও না। মেয়েদের কৌতূহল কাপড়ে বেশি, কাগজে নয়।

কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট, সেদিনই সন্ধ্যার পর ইন্দিরার এক টুকরো সাদা কাগজের দরকার হ'ল। বোধ হয় পরের দিন বাজারের ফর্দ্দ করবে ব'লেই। কোথাও সাদা কাগজ খুঁজে না পেয়ে ইন্দিরার মনে পড়ল অজিতের ব্যাগের কথা, ওর আফিসের লেটার প্যাড থাকে ওর মধ্যে। কাগজের অভাব নেই। তার পরের কথা অনুমেয়। নরম প্যাকেটে হাত ঠেকতে বার ক'রে খুলে দেখলে। আগুন রঙের শাড়ি। ফর্দ্দ করা আর হ'ল না, আগুন হয়ে ব'সে রইল সে স্বামীর প্রতীক্ষা ক'রে। অনায়াসে এমন মনে করা চলত যে, তাকেই চমকে দেবে ব'লে অজিত লুকিয়ে রেখেছে কাপড়টা, কিন্তু এতদিনের ইতিহাসে তেমন কোন নজীর না থাকাতে সে কথাটা সে ভাবতেও পারলে না।

তখন অজিত বাড়ি ছিল না। ইদানীং ইন্‌সিওরেন্সের দালালি ধরেছিল একটু-আধটু, সেই কাজে বেরিয়েছিল। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কি গো, অমন ক'রে ব'সে যে?'

তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে পাল্‌টা প্রশ্ন এল, 'এ কাপড় কার?'

'কাপড়?'—থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে অজিত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। শাড়ি। মনে পড়ছে না?'—আঙুল দিয়ে দেখায় ইন্দিরা।

'ও, ওইটে!'—যেন ওটার কৈফিয়ৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাই ওর নেই। অথচ ততক্ষণে মাথা খোঁড়ে নিজের নিত্য-নতুন মিথ্যা-উদ্ভাবনী প্রতিভার কাছে; কিন্তু সহসা কোন কথাই যেন মনে পড়ে না। অনভ্যাসের জন্য ওরও এ কথাটা মনে পড়ল না যে বলে, ও তো তোমার জন্যেই।

অসহিষ্ণু ইন্দিরার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল।—'বেশ তো। ওইটে। কিন্তু তাতে কি হ'ল! কার কাপড়? তোমার ব্যাগে কেন?'

'ওটা—ওটা—বীণার জন্যে কেনা।'

বীণা অজিতের বন্ধু বাদলের স্ত্রী। দুই স্ত্রীতে ভাব হওয়ায় ইদানীং দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। বীণাও অজিতকে 'দাদা' বলে। অত তাড়াতাড়ি আর কারও কথা মনে পড়ল না।

'হঠাৎ বীণার কাপড়, তার মানে?'

'কাল ভাইফোঁটায় দেব।'

'কেন? ও কি তোমায় নেমন্তন্ন করেছে? কই, আজই তো এসেছিল, কিছুই বললে না তো!'

কি বিপদ! আজই বীণা আসবে তা কে জানত!

অজিত বললে, 'না, এমনই দেব।'

'তার মানে?'

হঠাৎ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে গলায় আওয়াজ।

'আসলে ব্যাপারটা কি জান?'—কণ্ঠস্বর সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে অজিতের, 'ওটা বাদলই কিনেছে। ওর মাকে তো জান, একখানা ভাল কাপড় বাদলের কিনে দেবার অধিকার নেই, তাই এই ছুতো। কেউ না জানে—তোমাকেও বলতে বারণ ছিল। কোনমতে বেফাঁস হয়ে গেলে

বীণা বেচারীর রক্ষা থাকবে না। তোমাকে যে বলেছি তাও বাদলকে ব'লো না। ভাববে, পেটে কথা থাকে না।'

'অ!'—নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে ইন্দিরা। সন্দেহটা ঠিক যায় কি?—আন্দাজ করার চেষ্টা করে অজিত।

পরের দিন ভোরে আর শাড়িখানা নিয়ে যাওয়া গেল না। শুধু হাতেই ফোঁটা নিয়ে আসতে হ'ল, অথচ এই বিপত্তি। উমাকে এত কথা বলবার দরকার নেই, তাকে বললে, 'কাপড় সেই দুপুরবেলা দেব পাগলী। বুঝিস তো!'

উমা অভিমান ক'রে বললে, 'আমি বুঝি তোমার কাপড়ের লোভেই ফোঁটা দিতে চেয়েছিলুম দাদা?'

'ছি! তা কি বলছি!'

তাই ব'লে অমন পছন্দমত কাপড়খানা, উমার নাম ক'রেই যেটা কিনেছে, সেটা বীণাকে দিতে মন চাইল না। দুপুরবেলা সেটা উমাকেই দিয়ে এল। কিন্তু আফিসের ফেরত বীণার জন্যে কাপড় কিনতে গিয়ে কিছুতেই ঠিক সেই রকম রঙের কাপড় কোথাও পাওয়া গেল না, অনেক খুঁজে কাছাকাছি যেটা পেলে সেইটে নিয়েই বীণাদের বাড়ির দিকে চলল। মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে যে, একবার মাত্র দেখেছে ইন্দিরা, তফাতটা অত সে বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া ঐ কাপড় প'রেই যে বীণা এর ভেতর ওদের বাড়ি যাবে কিংবা ইন্দিরা যখন আসবে তখন প'রে থাকবে, এরই বা মানে কি?

হঠাৎ কাপড় পেয়ে বীণা অবাক।—'এ কি দাদা, শাড়ি যে?'

'আজকের তিথিটা বুঝি মনে নেই ?'

'ছি ছি ছি !'—এতখানি জিভ কাটে বীণা।—'আমি আবাগী একটা ফোঁটাও দিলুম না আজ, সে শোধ কি এমনি ক'রে নিতে হয় ! এ লজ্জা যে আমার কোথাও রাখবার জায়গা রইল না দাদা।'

'তাতে কি, খাওয়াটা একদিন খাইয়ে দিও।'

বীণা তবু অনেক রকমে মাফ চাইলে। সত্যিই ওর লজ্জার সীমা ছিল না, তবে কিনা মেয়েরা শাড়ি পেলেই খুশি হয় ; সুতরাং লজ্জা ঢেকে ভেতরের আনন্দটা প্রকাশ পেতেও দেরি হ'ল না। শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠল সে, তখনই খাওয়াবার জন্যে পেড়াপীড়ি। অতি কষ্টে সেটা এড়িয়ে (কারণ দুপুরের ভোজ তখনও জীর্ণ হয় নি) সামান্য একটু মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল। কথা রইল, আর একদিন ভাল ক'রে খাবে সে।

তখন বাদল বাড়ি ছিল না, রাত্রে শালাদের জন্যে রাবড়ি আর মিষ্টি নিয়ে ফিবতেই খুশিতে উপ্‌ছে উঠে বীণা গিয়ে খবরটা দিলে, 'জানো গো, অজিতদা কি জুতোটাই মেরেছেন !'

'সে কি ? কি হ'ল ?'

'আমি ভাইফোঁটায় নেমন্তন্ন করিনি ব'লে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ে গেলেন।'

'শাড়ি দিয়ে গেলেন, এই বাজারে ? কই, দেখি ?'

শাড়িখানা নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'এ যে দামি শাড়ি দেখছি, তামাসা ক'রে এত খরচ করছে অজিত ? ওর অবস্থা যে এত ভাল হয়েছে তা তো জানতুম না।'

বীণা ওর কথার গূঢ়ার্থ তখনও বুঝতে পারে নি, তবু বলার ভঙ্গিতে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলে।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ উগ্র হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বরে—'মন্দ নয়, বেছে বেছে লোক বুঝেই দাদা বলেছ দেখছি, এমনি আর গোটাকতক দাদা জুটিয়ে নাও না, আমার অনেক মুশকিল আসান হয়ে যায়।'

এবার আর বুঝতে দেরি হ'ল না বীণার।—'তার মানে ?'

'তাই বলছি ইদানিং দাদার প্রতি তোমার টান যে কিছু বাড়াবাড়িতে পৌঁচেছে, সেটা আমার চোখ এড়িয়েছে মনে ক'রো না। কিন্তু আমার সহ্যের সীমা আছে এটা সে রাস্কেলকে বুঝিয়ে দিও।'

'ছি ছি! কি বলছ তুমি!'—ব্যাকুল হয়ে ওঠে বীণা।

'যাও যাও। আমি ঘাস খাই নে, বুঝলে!' শাড়িখানা কোলের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও-ঘরে চ'লে গেল বাদল। ক্রূর সংশয় যখন একবার মনের মধ্যে মাথা তোলে তখন অত্যন্ত সহজ কথারও কুটিল অর্থ বোধগম্য হয়, এতদিনের অতি সাধারণ ও সহজ সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রীতির আদান-প্রদানও অত্যন্ত কুৎসিত অর্থ নিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়াতে লাগল বাদলের চোখের সামনে।

সেদিনকার ওদের অবস্থা অবর্ণনীয়। বীণার ভাইয়েরা তবু যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ একটা মুখোশ রাখতে হয়েছিল, তারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও খ'সে পড়ল। দুজনেই সে রাত্রে উপবাসে কাটালে, বীণা বিছানাতেও শুল না, একটা মাদুরে মেঝেতে প'ড়ে রইল। সুবিধার মধ্যে বাদলের মা সেদিন বাড়ি ছিলেন না, অনেক অপ্রীতিকর জবাবদিহি থেকে অব্যহতি পেলে ওরা।

পরের দিন দুপুরে শুষ্ক ম্লানমুখে বীণা হাজির হ'ল অজিতদের বাড়ি। রিকৃশ ক'রে যাওয়া যায় ব'লে আসা-যাওয়াটা সহজ ছিল।

'কি হ'ল রে বীণা?' অমন ঝ'ড়ো কাকের মত চেহারা কেন?'—ইন্দিরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে বলবার আগেই চোখের জল বেরিয়ে যায়, তবু বীণা ধীরে ধীরে সব ইতিহাসই খুলে বলে। শেষে বললে, 'দাদা খুবই আঘাত পাবেন ভাই, তিনি দেবতা, নিজের বোনের মত দেখেন ব'লেই দিয়েছেন। কিন্তু তুই সব কথা খুলে ব'লে আমার হয়ে মাফ চেয়ে নিস। এ ক্ষেত্রে এ কাপড় আমি একদিনও বাড়িতে রাখতে পারব না।'

ইন্দিরা ওকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে, জোর ক'রে কিছু খাইয়ে, ব্যাপারটা আজই মিটিয়ে নেবার জন্যে বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বীণাকে বিদায় করলে, কিন্তু তারপরই ওর মুখে নেবে এল আষাঢ়ের মেঘ, সে মেঘে বোধ হয় বজ্রেরও আভাস ছিল।

বেচারী অজিত কিন্তু প্রথমটা সন্দেহ মাত্রও করে নি। আফিসের ফেরত এসে সবে জুতো খুলছে, ইন্দিরা কাপড়টা এনে ওর সামনে রাখলে খুব সহজ ভাবেই।

'বীণা এটা ফেরত দিয়ে গেছে আর তোমার কাছে মাফ চেয়ে গেছে।'

আড়ষ্ট অভিভূত অজিতের গলা দিয়ে কোন মতে স্বর বেরোয়।—'সে কি!'

'হ্যাঁ। তোমার স্নেহের গতিটা ঠিক বাদলবাবু ধরতে পারেন নি। এই শাড়ি দেওয়ার অত্যন্ত কদর্থ ক'রে বিস্তর কটু কথা শুনিয়েছেন

বীণাকে। তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তারপর আর এ শাড়ি রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে, অথচ বাদলবাবু নিজেই কাপড়টা কিনে তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আশ্চর্য্য, হয়তো এটাও অভিনয়! কিন্তু বীণা কেঁদে কেটে মরছে। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তা নেই, কাল থেকে খায়ও নি ওরা কেউ। সব বুঝে তুমি মাফ ক'রো তাকে—এই কথা বার বার ব'লে গেছে।'

তারপর একটু থেমে, কণ্ঠস্বরে বিস্ময়কর মধু ঝরিয়ে বললে, 'ওদের বাড়িতে যেন কি আছে! দেখেছ, এক রাত্রে রঙটা কত ফিকে হয়ে গেছে, আর জরির আঁচলাটারও চিহ্ন নেই?'

ইন্দিরা আর এ ঘরে দাঁড়াল না। অজিত একটা কথাও বলতে পারলে না, ওর জিভ যেন আটকে গিয়েছিল। শুধু বহুক্ষণ পাথরের মত অনড় নিশ্চল হয়ে ব'সে রইল তেমনি ভাবে, জুতোর ফিতেটায় হাত দিয়েই।

এখন কতকাল যে এ অ-সহযোগ চলবে তার ঠিক কি? কথাবার্ত্তা তো বন্ধ হ'লই, মান অভিমান, জবাবদিহি এবং আবার অজস্র মিথ্যে কথা। পর পর সমস্ত পালাগুলো ছবির মত ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মন লাগসই মিছে কথা ভাবতে শুরু করে।

বিবাহের ইতিবৃত্ত

পাড়া সুদ্ধ, শুধু পাড়া কেন—পাড়ার বাইরে অন্য পাড়াতেও অনেকে—সবাই ওর আপন। কেউ বা ওর মামা, কেউ কাকা, কেউ মাসী, কেউ বৌদি, কেউ আর কিছু—সকলের সঙ্গেই একটা না একটা কিছু পাতানো আর প্রায় সমান ঘনিষ্ঠতা। এমন হয়ে গেছে যে বাইরে থেকে দেখে বোঝা মুস্কিল, এই এতগুলি মামী-কাকী-মাসীর মধ্যে কে ওর সত্যিকারের আত্মীয়।

আসলে ছেলেটি খুব পরোপকারী। সকলকারই কাজে লাগে। সেই জন্যই ঐ পাতানো আত্মীয়তা অত অন্তরঙ্গতায় দাঁড়াতে পেরেছে নইলে আজকাল কার জন্য কার মাথাব্যথা থাকে বলুন! শুধু পাতানো সম্পর্ক ধ'রে ডাকলেই কিছু নিজের আত্মীয় ভাবা যায় না।

মধু সকাল থেকেই ব্যস্ত। ভোর বেলা কোন্ মামার রেশন্ কার্ড জমা দিতে হবে—তাঁর ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গে না। কোন্ কাকা সাতটায় আফিস যান, তাঁর কার্ড জমা দেওয়া থাকে, সে রেশনটা নিতে হবে। কার মিস্ত্রী ডাকতে হবে, কার পোস্ট আফিস থেকে টাকা তুলতে হবে বা জমা দিতে হবে। কার মেথর খাটছে না, কমিশনারের বাড়ী দৌড়ও। কার কল্‌কাতা থেকে মাসকাবারী ডালমশলা আনতে হবে, বড়বাজার থেকে তেল-ঘি। কে রেল আফিস থেকে সস্তায় রেশন্ পান—সেটা আনা বড় হাঙ্গামা, তাঁর আফিস থেকে বার ক'রে মধু নিজের আফিসে এনে রাখে, বাড়ী ফেরবার সময়

ওকেই আনতে হয়। মুটে ভাড়া যে সবটা পাওয়া যায় না, বলাই বাহুল্য। এছাড়াও—টাকার তাগাদা, গোপন সংবাদ আদান প্রদান, জামার ছিট কিনে সাতসিকের কাপড় দেড়টাকায় ব'লে বাকী চার আনা গোপনে পাবার আশায় থাকা—নারীজাতির এসব সেবায় ত সে অদ্বিতীয়।

ফলে বেচারীর সকাল-সন্ধ্যা কখনও সময় নেই। ভোর বেলা বাড়ী থেকে বেরোয়—বাড়ীর বাজারও সব দিন হয়ে ওঠেনা, ভাগ্যিস্ ছোট ভাই ছিল তাই মায়ের রক্ষা—কোন মতে নটায় এসে স্নান ক'রে দুটি মুখে গুঁজেই দৌড়য়, কোন কোন দিন নিয়ম-রক্ষা করারও সময় থাকে না, মা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পর্য্যন্ত দৌড়ে এসে টিফিনের কৌটোটা দিয়ে যান, তাই দুপুরবেলা চলে; তারপর আফিস থেকে বেরিয়ে রাজ্যের লোকের ফরমাস সেরে বাড়ী ফেরবার পথে আবার সেই সব বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ফরমাসী কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ক্লান্ত ভাবে বাড়ী এসে পৌছয় এক এক দিন রাত নটারও পরে—কোন কোন দিন দশটাও বেজে যায়। মা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর বার করেন, বেশি রাত হ'লে ছোট ছেলে বাদলকে পাঠান ট্রাম লাইনের মোড় পর্য্যন্ত এবং গোপনে চোখের জল মোছেন—আর শেষ পর্য্যন্ত ছেলেকে ঐভাবে শ্রান্ত হয়ে ফিরতে দেখে জ্বলে উঠেন, 'ঘর জ্বালানে পর ভালানে !··· নিজের একটা কাজ হয় না, উনি এলেন রাজ্যি সুদ্ধ লোকের ফরমাস খেটে। তোর কবে কে কি ক'রে দেয় শুনি ! আর আমার সংসারের কাজগুলোই বা করে কে ? ঐ দুধের বালককে দিয়ে কত করাই ?'

আগে আগে মধু মাকে বোঝাবার চেষ্টা করত, ইদানিং সে ক্ষমতাও থাকে না।—এসেই বিছানায় এলিয়ে পড়ে। কোনমতে ঠেলে মুখ হাত ধুতে পাঠিয়ে মা ভাত বাড়তে যান, এক একদিন ভাত এনে দেখেন ছেলে

আসনে ব'সে পিছনের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে গভীর নিদ্রাভিভূত। খেতে খেতেও ঢুলে খাবারের থালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক একদিন। মা দুঃখ ক'রে মাথায় চাপড় মেরে বলেন, 'হা আমার কপাল রে! ছেলের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব—দিনে রাতে এমন সময়ও নেই!'

তা ছাড়া, অর্থব্যয়ও কি এজন্য কম হ'ত!

পাড়ার মাসী-মামী-বৌদির দল সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতেন যে মধুর মত (বা মধু ঠাকুরপোর মত কিম্বা মধুদা'র মত—সম্পর্ক বিশেষে) বাজার কেউ করতে পারে না। সে প্রশংসার নেশা আছে বৈ কি! ফলে দুটাকা চার আনায় জিনিষটা এনে একটাকা চৌদ্দ আনা বলতে হয়। বলা বাহুল্য সে দামে আর কারুর পক্ষেই পাওয়া সম্ভব নয় সুতরাং মধুর বাজার করা সম্বন্ধে অসামান্য দক্ষতার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। আর কে এমন লোকসান দেবে···এরকম বাজার সাধারণত তরুণ ছেলেরা একটি মাত্র মেয়ের জন্যই ক'রে থাকে—আর সে মেয়ে আর যাই হোক্—মা-মাসী-দিদি নয়। কাজেই মধু মধুই, সেখানে আর কেউ যেতে পারে না—চায়ও না হয়ত। এতে ক'রে মধুর মাসে অনেকগুলি টাকাই যায়, সে টাকার হিসেব বোঝাতে গলদ-ঘর্ম্ম হয় মার কাছে, বাইরে থেকে আরও নানা উপায়ে এটা রোজগার করতে হয়।

তবু পরোপকারের নেশা কাটে না ওর—যেন বেড়েই যায়।

পরোপকার যে করে তার মনের মধ্যে একটা সহজ প্রসন্নতা থাকে। আত্মপ্রসাদের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পায় সে। কিন্তু সে উপকার যাকে হাত পেতে নিতে হয় সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে থাকে। তাই তাকে

অচিরে সে উপকারের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বার করতে হয়—অর্থাৎ উপকার করার মধ্যে উপকারীরও স্বার্থ আছে এইটে নিজের কাছে প্রমাণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়—কৃতজ্ঞ হবার দায় থাকে না আর!

মধুর সম্বন্ধেও ওর পাতানো আত্মীয়রা এমনিই একটা কারণ (স্বার্থ শব্দটা অপ্রীতিকর) খুঁজে বার ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কৃতজ্ঞতার অভাব তাঁদের বিবেককে আর পীড়া দেয় না।

সেটা কি ?

মধু একটু খেতে দেতে ভালবাসে। যে যখন যা দেয় মধু সাগ্রহে ও সানন্দে হাত পেতে নেয়—শারীরিক অবস্থা বা সময় অসময় বিচার করে না। এমন কি তাগাদা ক'রে খেতেও ওর সঙ্কোচ নেই। কোন বাড়ীতে হয়ত রেশন্ পৌছে দিতে ঢুকল, বাইরের সদর থেকেই হাঁক পাড়লে, 'ও মামিমা, কী রান্না হচ্ছে ? ডাল ?···বা, মুগের ডাল। আপনি বেশ চাপ চাপ মুগের ডাল রাঁধেন কিন্তু, আর কেউ এমন পারে না।'

'খাবে নাকি বাবা একটু ? শুধু একটু ডাল, বলতেও যেন লজ্জা করে।' মামীমা হয়ত বললেন।

'তাতে কি হয়েছে। দিন না একটা বাটি ক'রে।···আবার মাছের মুড়ো পড়েছে ? তোফা।'

একবাটি ডাল শেষ ক'রে সেখান থেকে বেরিয়েই যেতে হ'ল হয়ত আর এক বৌদির কাছে। তাঁর ডি-এম্-সি স্তো রং মিলিয়ে কিনে দিতে হবে। রান্নাঘরের চৌকাঠে চেপে ব'সে প্রশ্ন করে, 'এমন অসময়ে পরোটা ভাজছেন বৌদি ?'

'ঐ যে ওঁর টিফিন—'

'ও, গোরখদার টিফিন যায়, না ?'

'খাবে নাকি ভাই একখানা গরম গরম ?'

'না না না।...গোরখদার টিফিন থেকে আবার ভাগ বসাতে হবে না—'

'তা হোক্—বেশিই আছে দু'খানা। খাও না। কিন্তু কি দিয়ে খাবে ?'

'তার জন্যে আবার ভাবনা, গুড় দিয়ে দিন না।'

'ভেলি গুড় যে।'

'তা হোক্।'

এরপর মাসীমার বাড়ী কচুশাক, আর এক দিদির কাছে মাছ ভাজা শেষ ক'রে যখন বাড়ী ফেরে তখন না থাকে আর খাবার সময়, না থাকে ইচ্ছা।

বিকেলেও এই ভাবে চলে। কোথাও রুটি, কোথাও তরকারী, কোথাও বেগুনি, কোথাও সন্দেশ—এই ভাবে তিল কুড়িয়ে তাল ক'রে বাড়ী ফেরে মধু। ফলে পেটের গোলমাল ওর লেগেই থাকে। কিন্তু এ বয়সে সেটা গ্রাহ্য করার কথা নয়।

সুতরাং উপকৃতরা যদি মনেই করে যে, এই সব খাবার লোভেই মধু ওদের বাড়ী যাতায়াত করে এবং সেই যাতায়াতের সুযোগ খোঁজবার জন্যই সে পরোপকার ক'রে বেড়ায়—ত খুব দোষ দেওয়া যায় কি ?

কিন্তু খাওয়াটা যদি শুধু পরের পয়সাতেই সম্ভব হ'ত তাহ'লে হয়ত প্রতিবেশিদের এ মনোভাব মেনে নেওয়া চল্‌ত। তাঁদের ওখানে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে ওর যে অর্থব্যয় হয় সে কথা তাঁদের জানবার কথা নয় অবশ্য—কিন্তু ওর নিজের বাড়ীর ইতিহাসও কম নয় ত !

একে ত আয় কম—সংসারটা চলেই ওর মার নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির

জোরে, তায় খাটবার লোকও কম। শুধু ত মা। সুতরাং মধু সোজাসুজি কোন ফরমাস করতে পারে না। তাকে ছুতো খুঁজতে হয়।

'মা, এবার তোমার সাবিত্রী পূজোর উদ্‌যাপন না?'

'এ বছর ত না। আসছে বছর।'

'আসছে বছর বুঝি? অ।...ত্যাখো মা, কিরণ মামা বড্ড বাজারের মধ্যে যা তা বলে।'

'কী বলে রে?' মা মুখ টিপে হাসেন।

'বলে, কতকাল তোর মায়ের হাতের মাছের মুড়ো দিয়ে ছোলার ডাল আর সেই বড় বড় ক'রে কোটা কুমড়োর দালনা খাইনি—তোর মা একেবারে আমাকে ভুলে গেছে।'

'ও, এই যা তা।' মা বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, হবে। তোমার কিরণ মামা যদি প্রত্যেক মাসেই যা তা বলতে শুরু করেন ত চলে কী ক'রে বলো। ...এত পেরে উঠি কোথা থেকে?'

'প্রত্যেক মাসে ব'লো না। সেই কবে খাইয়েছ। খাবে ত দু'খানা পরোটা আর একটু ছোলার ডাল।'

'—না বাবা।' মা দৃঢ় স্বরেই বলেন, 'এখন তাই বলছ কিন্তু বাজার করার সময় তিন রকম মাছ আবার মাংস আনবে, তখন বলবে মামা বলেছে ব'লে সত্যি সত্যিই কি আর ঐ ডাল কুমড়ো দিয়ে খাওয়ানো যায়। মাস কাবারের আগে আর ও ঝঞ্ঝাট ক'রো না ব'লে দিলুম।'

খুবই ক্ষুণ্ন মনে চুপ ক'রে থাকে মধু।

একদিন হয়ত সকালে উঠে বলে, 'মা, কাল রাত্রে কি স্বপন দেখেছি জানো?...অদ্ভুত স্বপন, সত্যি। বাবা যেন এক পুঁটুলি বাজার নিয়ে বাড়ী

ঢুকছেন। আবার সেই আগের মত। এসেই তোমাকে ডেকে বলছেন, বড় বৌ, খুব ভাল চিংড়ি পেয়েছি আজ, একটু মালাইকারী করো দিকি, ভাল ক'রে। নারকেল কিস্‌মিস্‌ সব এনেছি গুছিয়ে—'

মা একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে হয়ত বললেন, 'এই স্বপনটা আজকাল একটু বেশি দেখছ, না বাবা? তিনি অবিশ্যি তোমার মতই পেটুক ছিলেন কিন্তু আমাকে না দিয়ে কেবল তোমাকেই স্বপন দিচ্ছেন—এটা যেন কেমন কেমন লাগে। আমাকে কি তিনি ভুলেই গেছেন?…অথচ এটুকু ত টন্‌টনে জ্ঞান আছে এখনও যে রাঁধব আমিই—'

অভিমানাহত কণ্ঠে মধু উত্তর দিলে, 'আমি কি বাবার নাম ক'রে মিছে কথা বলছি!'

'ছি ছি!' জিভ কেটে মা বললেন, 'তাই কি বলছি।…আমি বলি হয়ত তুই কেবল ঐসব কথা ভাবিস ব'লেই স্বপন দেখিস।'

'তাই যদি বোঝ ত ও নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? স্বপন স্বপনই—আর কিছুত নয়!' রাগ ক'রে বলে মধু।

কিন্তু তা ত আর সত্যিই হয় না। মা শেষ পর্য্যন্ত চুপ ক'রে থাক্‌তে পারেন না। একটি ব্রাহ্মণকে ডেকে একদিন বড় চিংড়ির মালাই-কারী খাওয়াতেই হয়। আর শুধু মালাইকারী কিছু খাওয়ানো যায় না, লুচির পাত, ভাজা ও ডালনা, ডাল, মাছের কালিয়া, চাট্‌নি সব কিছু দিয়েই সাজিয়ে দিতে হয়। কী খুশি সেদিন মধু! বড় চিংড়ি একটা ওর জন্যও ছিল—বলা বাহুল্য। খেতে খেতে আনন্দে চোখ বুজে বলল, 'মা, হাতখানা তোমার সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে!'

বাদল ক্লাস টেন্‌-এ পড়ে। সুতরাং এখন সে অনেকটাই স্বাধীন হয়ে

উঠেছে, দেখে শুনে কুট্ ক'রে ফোড়ন কাটে, 'পরের পয়সায় খেয়ে আনন্দ সবাই করে দাদা, তোমার মত নিজের পয়সায় নিজেই ভাল মন্দ খেয়ে ফূর্তি করতে কাউকে দেখিনি।'

কথাটা আঁতে গিয়ে লাগে। জোরে ওকে একটা ধমক্ দেয় মধু। 'থাম্ থাম্—বড্ড বড় বড় কথা হয়েছে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করিস? এই তোর শিক্ষা হচ্ছে! কী লাভ ইস্কুলে পড়ে? পড়াশুনো ছেড়ে কারখানায় কুলিগিরি করগে যা!'

মা তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা থামিয়ে দেন।

ব্যাপারটা সব চেয়ে চরমে পৌছল ওর কাকাকে নিয়ে। ওদের এক বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান কাকা থাকতেন আসামের দিকে। বিশেষ খোঁজ খবর কেউই রাখত না—শুধু বিজয়ায় ছুটো চিঠি যেত ছুদিকে এই পর্য্যন্ত। তাঁর অবস্থাও ভাল না—কখনও কিছু সাহায্য করতে পারেন নি এদের, তবে নিজেও চাইতেন না। সম্পর্ক রাখার তাগাদা কোন পক্ষেই ছিল না।

হঠাৎ একদিন কে যেন এসে খবর দিলে যে, বন্যায় ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালাতে গিয়ে নৌকোডুবি হয়ে সেই কাকা ওর মারা গিয়েছেন।

'ডুবে মরেছেন? কী সর্বনাশ। সে ত অপঘাত। তিন দিনে ঘাট।...কবে মারা গেছেন বলছেন? গত সপ্তাহে।...ওরে বাবা, সে ত বহুতদিন হয়ে গেছে। তাহ'লে কাল সকালেই কামাতে হয়। পরশু শ্রাদ্ধ। আমাকেই ত করতে হবে। তাঁর ত আর কেউ নেই। ছাখো দিকি মুস্কিল!'

বাড়ী ফিরতে মা সব শুনে বললেন, 'কিন্তু সে যে অন্তত দু'শ তিনশ টাকা খরচা রে! যেমন তেমন ক'রে সারলেও ওর কমে হবে না। তা ছাড়া নিদেন বারোটি বামুন খাওয়াতে হবে। জ্ঞাত ভোজন—খরচা আর ঝঞ্ঝাট কি কম।·· ভাল ক'রে না জেনেই এ সব করা কি ঠিক। কে কি বললে—কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই অমনি কাকের পেছনে দৌড়বি।'

অসহিষ্ণু ভাবে মধু বললে, 'তুমি কি বলছ মা, মরার খবর কি কেউ মিছি মিছি দেয়? জীবনমরণের ব্যাপার নিয়ে কি আর কেউ ঠাট্টা করে! তা ছাড়া এর ভেতর অবিশ্বাস করবার আছেই বা কি—'

'তবু একটা চিঠি লিখে জানলে হ'ত না?'

'এ ধারে যে শুনলেই অশৌচ মা। জেনে শুনে এই অশৌচের ভাত খাব?'

অবশ্য খেতে ব'সেই আলোচনাটা হচ্ছিল। মা সে কথা আর মনে করিয়ে দিলেন না। মধু বললে, 'তাছাড়া আমার মন বলছে কথাটা সত্যি! আজ দিন পনেরো ধ'রেই তোমাকে বল্‌ছি না, মনটা কেমন হু হু করছে, কোথায় যেন কি অনিষ্ট ঘট্‌ছে! কেবলই যত অমঙ্গল মনে হ'ত।'

পরের দিনই ঘাট কামিয়ে শ্রাদ্ধের বাজার ক'রে শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। আফিস থেকে জরুরী দেনা করতে হ'ল—সবাই অবশ্য খুব সাহায্য করলেন, মধুকে কে না ভালবাসে! বারোটি বামুন উপলক্ষ্য ক'রে জন পঞ্চাশেক লোক খেলো। কাকা কি কি খেতে ভালবাসেন কল্পনা ক'রেই মধু সবগুলি সংগ্রহ করলে। নিয়মভঙ্গের দিনও মাছ-মাংসে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। খরচাটা দু'তিনশ'তে শেষ হ'ল না—ছশ'তে গিয়ে পৌঁছুল।

খালি এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজনে—একটু খুঁত বেরুল সব শেষে। বাদল যে ইতিমধ্যে আসামের ঠিকানায় একখানা চিঠি কবে দিয়েছিল তা কেউ জানে না—নিয়মভঙ্গের একদিন পরেই তার উত্তর এসে পৌঁছল, কাকার স্বহস্তাক্ষর—তিনি খোস্‌মেজাজে বহাল তবিয়তে জীবিতই আছেন।

এরপর রাগ ক'রে মধু সাত-আটদিন বাদলের সঙ্গে কথা কয়নি, যেন কাকার জীবিত থাকার দায়িত্বটা তারই।

কিন্তু শুধু পরোপকার নিয়েই সত্যি-সত্যি কারুর দিন কাটে না। মধুর বয়স হয়েছে সে কথা সে ভুলে গেলেও বয়স বাড়াবার যিনি মালিক তিনি ভোলেন নি। কখন যৌবন ভেতরে ভেতরে বিকশিত ক'রে তুলেছেন, অধীর ক'রে তুলেছেন তাকে সে কস্তুরীগন্ধে, তা জীবন-দেবতাই জানেন—হঠাৎ একদিন মধু আবিষ্কার করল তার জীবনটা বড় ফাঁকা। রাত্রে ফিরে এসে যখন সে কাপড় ছাড়ে, মনে হয় কেউ এসে বাতাস করলে কি জুতোটা খুলে নিলে ভাল হ'ত। কিংবা শুধু যদি রাত্রে পরবার লুঙ্গিটাও হাত বাড়িয়ে দিত! বিছানায় শোওয়ামাত্র আগে সুগভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজে আস্‌ত, চৈতন্য পড়ত শিথিল হয়ে, আজকাল আর তা হয় না। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত এপাশ ওপাশ করে সে, ক্লান্তিটাই যেন ঘুমের বাধা হয়। সব চেয়ে আফিস বেরোবার সময় বিরক্তির শেষ থাকে না—ঘড়ি, কলম, চশমা—সব নিজে হাতে গুছিয়ে নিতে সময় হয় না। ভালও লাগে না। জামাতে বোতাম পরাবার কথা মনে পড়ে বাস-এ উঠতে গিয়ে।

না, এরকম ক'রে আর চলে না।···লোক চাই জীবনে।···

কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে মা গোপনে সওয়া পাঁচ আনার হরির লুট মানলেন কিন্তু পাড়ার মামীমা-মাসীমাদের দুশ্চিন্তার শেষ রইল না। তাঁরা নানা রকমে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এই অবস্থায় ওর বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়। সামান্য আয়ে আবার একটা ঝঞ্ঝাট বাড়লে বিব্রত হয়ে পড়বে। ছেলেপুলে যদি বাড়তে থাকে ত কথাই নেই। তার চেয়ে বরং বাদল একটু মাথা-ধরা হয়ে উঠলে—

অসহিষ্ণু মধু বলে, 'সে ত তখন আলাদা হয়ে যাবে মামিমা, ভাইয়েরা দাদাকে ততক্ষণই সহ্য করে যতক্ষণ সে নিজে রোজগার করতে শেখে না!'

'না না, তা কেন! রোজগার করলেই কি আলাদা হয়? বিয়ে-থা করলে তবে—'

কিন্তু এসব কথা আর মধুর ভাল লাগে না। সে বুঝতে পারে এতদিন পরে যে এরা স্বার্থপর। এই সব মামীমা-মাসীমা-দিদি-বৌদিদিদের স্বামীরা যে স্বাচ্ছন্দ্যটা পায়, বাইরে থেকে মধু সেইটেই দেখে; দুঃখটা থাকে তার চোখের আড়ালে—সংঘাত ও সংগ্রামের ইতিহাস থাকে অজ্ঞাত—তাই বলা যেতে পারে ওর এই মনোভাবের মূলে আছে এরাই। এখন ফেরাতে চেষ্টা করলে মধু শুনবে কেন। মনে হয় মধুকে হারাতে হবে এই ভয়ে ওদের ঐ সদুপদেশ।

মা মেয়ের সন্ধান করেন। মধু সাবধান ক'রে দেয়, 'মা, শুধু মেয়ে দেখে ভুলো না কিন্তু। টাকা চাই আমার। এত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন, কাকে বাদ দিয়ে কাকে বলব? দু'শ আড়াইশ লোক হবে বৌভাতে। হাজারটি টাকা থোক্ চাই আমার।'

'হাজার টাকা ত তাহ'লে তোর খাওয়াতেই যাবে। তাতেও কুলোবে না। গায়ে-হলুদ পাঠাবো কিসে?'

'তা জানিনা। সেই বুঝে টাকা চাও।'

'এত টাকা আবার ভাল মেয়ে তোকে দেবে কেন? কী আছে তোর।'

মধুর মুখচোখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে। রাগ ক'রে বলে, 'তবে বিয়ে দিচ্ছ কেন? এতই যদি অপদার্থ?…দরকার নেই। মেয়ে দেখো না।'

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মোট হাজার টাকাতেই রাজী হ'তে হয়। মা একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছেন তাদের। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মেয়ে—মুখশ্রীও ভাল। আর দেখতে পারবেন না তিনি।

অগত্যা।

কাকার শ্রাদ্ধের দেনা কতকটা শোধ হয়ে এসেছে। আবার আফিসেই ঋণের দরখাস্ত পাঠাতে হয়। তা ব'লে বৌভাতের আয়োজন সে কমাতে পারবে না।

আর আয়োজনও সামান্য হ'লে চলবে না তার। ফর্দ্দ ক'রে ফেলেছে। চিংড়ির মালাইকারী, মাছের কালিয়া এবং মাংসের কোর্ম্মা। লুচি ও ঘি-ভাত। বনস্পতির লুচি সে খাওয়াবে না। ভাল ঘি আনবে খুঁজে খুঁজে। বরং ঘি-ভাতটাকে কোন মাছ বা ছানা-ভাজা দিয়ে পোলাও করবে কিনা ভাবছে সে।

মা মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁরে এত বাড়াবাড়ি কেন। বড়লোকের বিয়েতেও যে এমন ধুম হয় না।'

মধু বলে, 'মা, বিয়ে আমার এই একবারই হবে। টাকা হয়ত ঢের রোজগার করব—কিন্তু এদিন কি আর আসবে? এতে আর ফ্যাকড়া তুলো না।'

মা চুপ ক'রে যান। সত্যিই, অল্প বয়স থেকে চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে। জীবনে আমোদ-আহ্লাদ কি তা জানেই না। খেটে খেটে জীবন গেল।

বাদল শুধু চিমটি কাটে, 'বিয়ে কারুর কারুর দু'তিন বারও হয় দাদা। বলা কি যায়!'

আগুন হয়ে উঠে মধু বলে, 'তুই থাম। সে আর বিয়ে নয়—দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষে যদিই বা কেউ বিয়ে করে, সে বিয়েতে কি ঘটা হয়?'

'বলা কি যায়। যার যা অভ্যাস।'

কিন্তু বাদলের কথায় কান দিতে গেলে চলে না। মধু নিজের মনোমত আয়োজনই ক'রে যায়। মিষ্টি তিন রকম—দরবেশ, পানতুয়া আর রাজভোগ। প্রথম দুটো বাড়ীতে হবে। রাজভোগ আনাবে ভীমনাগের দোকান থেকে। ওটা বাড়ীতে ভাল হয় না। সন্দেশ করবে না—সন্দেশ কেউ খেতে চায় না।

গায়ে-হলুদের বাজারে মধুর মন নেই। সেটা মা তার ভাইকে দিয়ে করান। খালি তত্ত্বের মিষ্টি নিজে পছন্দমত সাজিয়ে দেয় সে। ভাল দোকান থেকে ভাল ভাল মিষ্টি, দই, রাবড়ি ইত্যাদি।

তত্ত্বের লোক ফিরতে মধু জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কেমন খাওয়ালে ওরা? কী কী করেছিল?'

মা ধমক দেন, 'এখন কি আর পুরো রান্না হয়? ওদের কোন মতে খাইয়ে দিয়েছে। ওরা কি জানে?'

বাদল বলে, 'আর তাতেই বা তোমার দরকার কি দাদা, তুমি আর কী-ই বা খাবে!'

'কেন?' চমকে ওঠে মধু।

'বা রে! একে সারা দিন উপবাসের পর অত রাত্রে খেতেই ইচ্ছে করে না। একটু জলখাবার খেয়েই পেট ভরে যায়, তায় তুমি জামাই-মানুষ, বেশি খেলে ওরা নিন্দে করবে যে। আর খাওয়া ঠিকও নয়—বাসর জাগতে হবে, শরীর খারাপ করবে।'

'হুঁ। তাই ব'লে উপোষ ক'রে আমি রাত জাগতে পারব না।' খুব গম্ভীর ভাবে বলে সে।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই কিছু সে খেতে পারে না। নববধূ, বিবাহের আচার অনুষ্ঠান, সে-ই এ নাটকের নায়ক এই বোধ, সবটা মিলিয়ে ক্ষণকালের জন্য ওকে ওর অভ্যস্ত জগতের উর্দ্ধে নিয়ে যায়। তাছাড়া লজ্জাও করে বৈকি! সামান্য একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে সবই ফিরিয়ে দেয়। তখন আর লুচি মাছ প্রভৃতির কথা ভাবতে পারা যায় না যেন।

পরের দিন এবং তার পরের দিন কিন্তু ওর বধূর কথা মনে থাকে না। বিবাহের উপলক্ষটাই ভুলে যেতে বসে সে। লোক খাবে এটাই বড় কথা—কারণটা গৌণ।

আয়োজনও বেশ রাজকীয় হ'ল বৈকি! খুঁত নেই কোথাও। পণের হাজার টাকা, আফিসের চার শ' উড়ে গেল—আশপাশ থেকে আরও দুতিন শ' টাকা সংগ্রহ ক'রে আনল মধু। তা হোক—বিয়ে একবারই করছে সে, কোন খুঁৎ কোথাও রাখতে দেবে না।

কিন্তু তবু রাত দশটা নাগাদ চোখে অন্ধকার দেখলো।

ফর্দ্দ টেনে টুনে মা কমিয়ে দু'শতে দাঁড় করিয়েছিলেন। মধু আয়োজন করেছিল সামান্য একটু বাড়িয়ে। সেটা মাকে জানতে দেয়নি। মা যে-সব

লোককে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন তাদের সবাইকে বাদ দিতে ওর মন সরছিল না। কিন্তু গোপনে বলতে বলতে সংখ্যাটা কোথায় চলে যাচ্ছে সেটা ওর হুঁশই নেই—বৌভাতের দিন বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত যার কথা মনে পড়ছে তাকেই বলেছে সে। মনের মধ্যে আশ্বাস ছিল যে, আয়োজন ত বেশি রইলই।

ফলে দশটার সময় সকলেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। মা মধুর সামনে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে মাথা খুঁড়লেন। মামা গিয়ে অত রাত্রে কার বাক্স খুলিয়ে কিছু মাছ সংগ্রহ করলেন; তখন আর ঘি নেই, পাড়ার দোকান খুলিয়ে সেই বনস্পতি। কিন্তু ততরাত্রে নতুন ক'রে রেঁধে আবার লোক বসাতে বসাতে দীর্ঘ সময় কেটে গেল—অনেকে ব'সে ব'সে রাগ ক'রে চলেই গেলেন।

সবাই দোষ দিতে লাগল মধুকে। সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক হ'ল বাড়ীর লোক যখন খেতে বসল তখন কোর্মা কি মালাইকারীর কাই পর্য্যন্ত নেই। ফুলশয্যার মিষ্টি দিয়ে মান রক্ষা হয়েছিল, তাও তখন শেষ হয়ে এসেছে। মাছের কালিয়ার ঝোল আর পান্তুয়ার রস দিয়ে কোন মতে বনস্পতির লুচি খেয়ে পেট ভরালে সবাই।

তখন দেনাও এমন ভয়াবহ অঙ্কে পৌঁচেছে যে 'কাল ভাল ক'রে আবার খাওয়াবো' এ আশ্বাসও ওর কণ্ঠে ফুটল না।

তবু ওর আশা ছিল যে অন্তত ওর জন্য মা সামান্য কিছু কোথাও সরিয়ে রেখেছেন। যখন সে সম্ভাবনা পর্য্যন্ত রইল না, তখন সে ক্লান্ত ভাবে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে চোখ বুজলে।

বাদল বললে, 'যা হোক কিছু খাও দাদা—হাত গুটুলে কেন?'

'থাক্‌গে—আর পারছি না।'

মুড়কীর ফলার মাখ্‌বার সময় দেখা গেল ক্ষীর নেই, সব খরচ হয়ে গেছে। কোন মতে নিয়ম রক্ষা, জলখাবারের থালাটা ছিল বটে কিন্তু ক্ষোভে, লজ্জায়, হতাশায় তখন ওর যা মানসিক অবস্থা, তাতে কাটা ফল আর ক্ষীরের ছাঁচের দিকে চাইতেই পারছিল না।

ফুলশয্যার আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যেতেই ক্লান্ত অবসন্ন বিরক্ত মধু ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। বৃথাই পাড়ার মেয়েরা আড়ি পাতলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও কিছু শোনা গেল না।

তরুণী নববধূ আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইল্‌, বহু, বহুক্ষণ ধ'রে। সে বুঝতে পারল না তার কোন অপরাধ হয়েছে কি না। স্বামী রাগ করলেন কেন তা সে অনেক ভেবেও কল্পনা করতে পারলে না। শুধু বহু-প্রতীক্ষিত আজকের রাতটি ওর বৃথা গেল, এইটেই সত্য।

ওর গায়ের ফুলের গহনা কেউ খুলে দেয়নি, সে কাজটা স্বামীরই—সবাই এই ভেবেছে হয়ত। শেষ কালে ও নিজেই আস্তে আস্তে সেগুলি খুলে রাখল।

ওদের গলার মালা ম্লান হয়ে এল, রজনীগন্ধার গন্ধ এল ক্ষীণ হয়ে—একসময়ে পূর্ব্বাকাশে আলোর আভাস পেয়ে নতুন বউ দোর খুলে বাইরে এসে জড়ো-করা কুশাসনগুলোর ওপর কাৎ হয়ে গুড়ি মেরে শুয়ে পড়ল। ওর চোখের জলের স্মৃতি বহন ক'রে আবার সেই ভাড়াটে আসন কোন্ বাড়ীতে যাবে হয়ত—আবার কোন্ বৌভাত ও ফুলশয্যায়!

কিন্তু মধুর এই রাত্রিটি ব্যর্থ-ই হয়ে গেল সব দিক দিয়ে।

অশান্ত মহাসিন্ধু

রাত চারটে না বাজতে বাজতেই ঘুরিয়ার বাবা ঘুরিয়াকে ডাকাডাকি শুরু করে। এমন রাগ হয় এক একদিন! ইচ্ছে করে বাপের মুণ্ডুটা ধ'রে মুখখানা বালির সঙ্গে ঘষে দেয়। বদ্‌মাইস্‌ পাজী বুড়ো। নিজে নেশা ক'রে পড়ে থাকবে সন্ধ্যা থেকে, ঘুম হবে না—আর ঘুরিয়াকেও ঘুমোতে দেবে না! সে কতদিন তবু বুঝিয়ে বলেছে, 'আমার হ'ল বড়লোক মক্কেল—আমার কি তোর মত হেঁজি-পেঁজি হোটেলের কেরাণীবাবু মক্কেল সব? আমাদের বাবুরা সাতটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। খুব সকালে যে চান করতে যায় সেও নটার আগে বালিতে পা দেয় না। আটটায় বিরিকফাস্ট করবে, তারপর দাড়ী কামাবে তবে ত!' কিন্তু কে কার কড়ি ধারে! তখনকার মত হয়ত এক্কলস্বামী ঘাড় নাড়ে—যেন কতই বুঝল সে—কিন্তু রাত তিনটে বাজলেই আবার যে-কে-সেই! এক্কলস্বামীর কিছুতেই খেয়াল থাকে না যে তাতে আর তার ছেলেতে ঢের তফাৎ।

সত্যিই—ঘুরিয়ার কর্ম্মক্ষেত্র হ'ল রেলের হোটেল। একমাত্র বড় আর বিলিতি ঢংয়ের হোটেল এখানকার। আগে সাহেব মেম ছাড়া বিশেষ কেউ আসত না—এখন অবশ্য সবাই আসে—বাঙ্গালীই বেশি, গুজরাটি, পার্শি, কেউ বাদ যায় না—মায় মাড়োয়াড়ী পর্য্যন্ত, আসে আর দর কষাকষি করে প্রত্যেক হাত। এটা যে বিলিতি হোটেল, এখানে সব বাঁধা রেট, তা কিছুতেই ওদের বোঝানো যায় না।

সে যাই হোক—সাহেব মেমরা এখন বিশেষ না এলেও যারা আসে তাদের মেজাজ আরও বেশি রকমের বিলিতি হয়ে যায়। ভোরে উঠবে কে? স্নান করতে যায় কম—যারা যায় তারাও বেশির ভাগ নামে 'লাঞ্চ্'এর আগে, এগারোটা বারোটা। সাহেব মেম যারা আসে তারা ত সবাই প্রায় স্নান করে বিকেলে, তিনটে চারটেয়। এর আগেও তাই ছিল—তখন সকালে কাজই থাকত না কারুর, বিকেলের চায়ের আগে সব চেয়ে বেশি ভীড় হ'ত স্নানের—এক একজন আবার চায়ের পর নেমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়ে থাকৃত জলে, তবে তাদের আর নুলিয়ার দরকার হ'তনা—এই যা!

এক্কলস্বামী এত কথা বোঝে না। সে বলে, 'ভোরে উঠে সমুদ্দুরের ধারে আমরা চিরকাল গেছি, ওতেই আমাদের ভাত, ওতেই আমাদের নেশা। আজ না গেলে চলে?'

ঘুরিয়া বলে, 'তুই ত নিত্য যাস্ ভোরবেলা, তাতে কত পয়সা হয়? রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার কাছ থেকে নেশার পয়সা নিতে হয়! ভাতের পয়সা ত ওঠেই না—আমার ঘাড়ে চেপে খাস্।'

এক্কলস্বামী এতে বিষম রেগে যায়, 'ভারি ত চার-ছটা পয়সা দিস্ নেশার—তার জন্যে এত কথা কিসের? পয়সা তোরই রোজগার হবে, আমার কি?'

'আমার রোজগার আমি বুঝব।' ব'লে ঘুরিয়া পাশ ফিরে শোয়।

গজ্ গজ্ করতে করতে এক্কলস্বামী নিজেই উঠে বেরিয়ে আসে ওদের সেই বুকচাপ সঙ্কীর্ণ ঘর থেকে। 'অমন না হ'লে আর বুদ্ধি!' আপন মনেই গজরায় এক্কলস্বামী, 'নইলে ঘরের বৌটা বেরিয়ে যাবে কেন।'

অবশ্য অত ভোরে উঠে এক্কলস্বামীরও যে বিশেষ কিছু রোজগার হয়, তা

নয়। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে খান-কতক জমাট ফেনা কিম্বা কিছু বাহারী ঝিনুক পেলে ত বরাত জোর—হোটেলের বাবুদের কাউকে উপহার দিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়ালে এক আনা দু আনা—কোন কোন ক্ষেত্রে চার আনা পর্য্যন্ত বকশিশ মেলে—অবশ্য মানুষ বিশেষে। একই হোটেলে একই 'চারজ্' দিয়ে থাকলেই যে এক রকম মেজাজ হবে তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ যা কঞ্জুষ হয়!

যে হোটেলে এক্কলস্বামী কাজ করে—অর্থাৎ যে হোটেলের নামের আদ্যক্ষর তার মাথায় তালপাতার টুপিতে লেখা আছে—সে হোটেলেও কেউ যে সাতটার আগে স্নান করতে যায় তা নয়—তবু এক্কলস্বামী সাড়ে পাঁচটা থেকে গিয়ে ব'সে থাকবে হোটেলের বারান্দায়, কেউ দোর খুলে বোরোলেই ঘটা ক'রে সেলাম দেবে এবং প্রশ্ন করবে 'কী বাবু, কখন লামা হবে সমুদ্দুরে?' কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'সক্কাল বেলা উঠে ব্যাটার মুখ দেখলুম, কী আছে অদৃষ্টে কে জানে!'

অবশ্য শুধু ঐ হোটেলের মক্কেল নিয়ে থাকলেই ওর চলে না। এই ত টুকু হোটেল—সব ভ'রে গেলেও সাতাশটা সীট, তাতে টুপি দিয়ে রেখেছে ওরা ছ' জন নুলিয়াকে। কীই বা পড়ে ভাগে! বুড়ো ব'লে এক্কলস্বামীকে অনেকেই নিতে চায় না। মেয়েরা ত নয়ই—নাক সিঁটকে বলে, 'ঐ ঢড়্ঢড়ে বুড়ো, ওকে কে সামলায় তার ঠিক নেই, ও আবার আমাদের সাম্লাবে।' কথাটা শুনলে এক্কলস্বামীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। দ্যাখনা পরখ ক'রে, সামলাতে পারে কি না সে! আসলে ছোকরারা হাত ধরলে ভাল লাগে—তা কি বোঝে না! মনের আক্রোশে এক্কলস্বামী নোংরা কথা বলতে বাধ্য হয়।

তার কপালে তিন-চারটের বেশি লোক কোন দিনই হয়না হোটেলে। তবে হোটেলের বাইরেও লোক ধরতে বাধা নেই তার। ভোর থেকে এসে ধন্না দেয় সে কতক্ষণ ঐ জন্যেই, হোটেলের কে কখন যাবে জেনে নিয়ে সে আসে-পাশের বাড়ীতে সেলাম দিতে যায়। তাতেও খুব বেশি হয় না। কারণ অন্য নুলিয়ারাও ত ব'সে থাকে না। সব জড়িয়ে যেদিন দশ-বারো আনা হয় সেদিন এক্কলস্বামী লাফাতে লাফাতে বাড়ী ফেরে। তাও হওয়া শক্ত বৈকি। রেট ত এক পয়সা থেকে বাড়তে বাড়তে এতদিনে দু আনায় এসে পৌঁচেছে। সকলে কিছু দু আনাও দেয় না—চার পয়সা দু পয়সাতেও রাজী হ'তে হয় এক এক সময়, নইলে চলে না। 'সিজ্‌ন্‌' যখন থাকেনা তখন আরও কম। লোক এলে যেন ভাগাড়ে মড়া পড়ার মত ছেঁড়াছিঁড়ি হয় শকুনে শকুনে—তখন দু পয়সা পেলেও ভাগ্য মনে হয়। সে সময় ত জাল-বোনা বা অন্য মজুরী খাটা ছাড়া উপায়ই থাকে না। জাল-বোনার সুতো জুটলে জাল-বোনাই সুবিধা, কিন্তু সুতোই বা আসে কোত্থেকে।

দশ আনা বারো আনা রোজগার হলেও সে ঘুরিয়াকে খাইখরচ হিসেবে কিছু দিতে পারে না। ঘুরিয়া রাগ করে কিন্তু এক্কলস্বামীর যে কুলোয় না কিছুতে। সারাদিন জলে থাকতে হয়, সে জন্যে গরম নেশা কিছু দরকার—সকালবেলা অন্তত বার দুই তিন গাঁজা না খেলে চলে না। আগে মদ পাওয়া যেত, মদ খেলে আর কোন নেশা লাগে না। এখন মদ বন্ধ হয়ে এই ত হয়েছে মুশ্‌কিল। আবার সারাদিন পরে খেটে খুটে গিয়ে একটু আপিং খেতে হয়, এ নেশাটাও ধরেছে সে বহুদিন। ঘুরিয়ার শালা মদ চোলাই করে গোপনে, সেটা পাওয়া যায় যেদিন ঘুরিয়ার হাতে টাকা থাকে।

ঘুরিয়া এক বোতল আনলে এক ভাঁড় এক্কলস্বামীও পায়—তবে সে রোজ জোটে না, অনেক ঝুঁকি নিয়ে যারা মদ তৈরী করে তারা সেই রকম দামই নেই। ভগ্নিপতি ব'লে কিছু ঘুরিয়াকে সস্তায় দেয় না।

কাজেই—মদ রোজ জুটলেও না হয় আপিংটা ছাড়বার চেষ্টা করত এক্কলস্বামী—এম্‌নি পারে না। আপিং খায় ব'লে এক কাপ চাও না খেলে চলে না। দুধ-মিষ্টি বেশি দেওয়া চা। যেদিন রোজগার প্রায় কিছুই থাকে না সেদিন গিয়ে কান্নাকাটি ক'রে হোটেলের চাকরের কাছ থেকে একটু চা খেয়ে নেয়।···গাঁজা আপিং ছাড়া চুরুট ত আছেই। মোট সাড়ে পাঁচ আনা বাঁধা। এর চেয়ে বেশী পয়সা হাতে এলে দুটোর মাত্রাই বেড়ে যায় তা বলা বাহুল্য। দু একটা পয়সা এর ভেতর ধারও হয়ে যায় এদিকে ওদিকে—যেদিন সামান্য কিছু বেশি আসে সেদিন সেগুলো শোধ করতে হয়। নইলে—পরে আর ধার জোটে না—এই বড় মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে।

ঘুরিয়ার অবস্থা অবশ্য স্বচ্ছলই। বিলিতি হোটেলের টুপি তাকে জোগাড় করতে হয়েছিল একটু কষ্ট ক'রেই—অনেকগুলি টাকা ঘুষও লেগেছিল কিন্তু তারপর থেকে আর ভাব্‌তে হয়নি বিশেষ। ওখানের রেট্ ছ আনা এখন, তবে সাহেবরা কেউই এক টাকার কম দেয় না। বাঙ্গালী সাহেবরাও তাই দেয়। মাড়োয়ারী ভাটিয়ারা দর কষাকষি করলেও আট আনার কম দেয় না প্রায় কেউ। ফলে দৈনিক দুটো-তিনটে লোক ভাগে পড়লেও দুটো টাকা কেউ ঘোচায়নি। এই জন্যেই এক্কলস্বামী হিংসে করে। মুখে অবশ্য বলে অন্য কথা—বলে, 'ভোরে উঠে সমুদ্দুরের ধারে অন্য বাড়ীগুলো ঘুরলে ত পারিস্—হোটেলে যা হবার হবে, বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করলে

কিছু দোষ হয়?' আসলে সে ঘুরিয়ার আরাম দেখতে পারে না, সেই জন্যেই ভোর না হতে হতে ওর পেছনে লাগে।

ঘুরিয়াও তা জানে। সেই জন্যে বেশি রেগে যায়। বুঝিয়ে বলবার যে চেষ্টা করেনি তা নয়। কতদিন বলেছে সে, 'দ্যাখ্ এত বড় একটা সাহেবী হোটেলের টুপি থাকে আমাদের মাথায়, আমাদের ইজ্জৎ কত? আমাদের কি আর হেঁজি পেঁজি লোকদের মত দোরে দোরে ঘুরলে চলে? ম্যানেজার বাবুদের নজরে পড়লে কি বলবে?' কিন্তু একলস্বামী কথাটা যেন বুঝেও বুঝতে চায় না। ইদানীং ঘুরিয়া তাই রাগ ক'রে খিঁচোয়, 'আসলে আমার রোজগার বেশি ব'লে তোর হিংসে হয়—আমি কি আর বুঝি না, নেশাখোর বুড়ো কোথাকার! যা, তোকে আর কাল থেকে খেতে দেবো না, তুই অন্য ব্যবস্থা করবি। এত ত বুড়ো মুলিয়া আছে এ পাড়ায়—তোর মত সব রোজগার নেশা ক'রে খেয়ে ব'সে থাকে কে তাই শুনি? নিজের যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে আমার রোজগারে নজর দিবি! ভারি আমার বাপ!'

বলে কিন্তু খাওয়াতেও হয়। সেই হয়েছে বিপদ। ঘুরিয়া যাই রোজগার করুক না কেন—এক পয়সাও থাকে না। তবুও ওর কপাল ভাল। বিয়ে-করা বৌটা ছেলে মেয়ে নিয়ে তার ভগ্নিপতির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কোন দায় নেই, ঝঞ্ঝাট নেই—শুধু সে নিজে আর বাপ। হ'লে কি হয়—ঘরের ভাড়া আছে, শুধু নুন ভাত খেলেও আজকাল চালের দাম কত—মাছ মাংস খেলে ত কথাই নেই। এ ছাড়া নেশা ত আছেই। এক বোতল মদ লুকিয়ে কিনতে গেলে একটি পুরো টাকা চলে যায়। গাঁজা লাগে তারও, চুরুটেও কম যায় না—সিদ্ধি পেলে খুশীই হয়, শুধু একটি নেশা ওর নেই সেটা হচ্ছে আপিং। সাংঘাতিক সর্ব্বনেশে নেশা—মানুষকে

একেবারে জানোয়ার ক'রে দেয়। ওর দেশের লোক যারা এখানে রিক্সা চালায়, তাদের এক একজন বারো আনা এক টাকার পর্য্যন্ত আপিং খায়, আবার বলে—না হ'লে পা চালাতে পারব কেন। আরে মর, সব রোজগার এক নেশাতে যদি চ'লে গেল ত খেটে লাভ কি? পেট খালি রেখে নেশা? এমন নেশা না করলে কি নয়? এরই জন্যে কি সেই সুদূর গঞ্জাম থেকে এখানে এসেছিস্?

না—ও নেশা ওর নেই। জলের কাজ যারা করে তাদের চাই গরম নেশা। ওতে কীই বা হয়। ঝিমিয়ে দেয় সব হাত-পা···মদ বলো, গাঁজা বলো···এসব নেশার মানে আছে।

কোন নেশা না ক'রে যে থাকা যায় তা ওরা জানে না—ওদের শিশুরাও ওদের সামনে ব'সেই বিড়ি চুরোট খায়। ওদের দেশে পয়সা নেই, ভাত নেই—তাই এতদূরে ওরা এসেছে রোজগার করতে—গ্রামকে গ্রাম খালি ক'রে চ'লে এসেছে ওরা—কিন্তু তবু খাটা-পয়সাতেও যেন মায়া নেই। কাপড়ের বালাই পুরুষদের নেই, একটু একটু নেংটি প'রে থাকলেই চলে, খাওয়াও শুধু ভাত, পান্তা ভাতই বেশির ভাগ—কেবল নেশা। নেশা আর মেয়ে মানুষ—এই-তেই এতকষ্টের পয়সা সব চ'লে যায়।

কথাগুলো এক এক সময়ে ঘুরিয়া ভাবে। প্রখর রৌদ্রে সমুদ্র যখন আঁকা ছবির মত দূরে প'ড়ে থাকে, বালির তাপ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এসে মুখে লেগে তন্দ্রায় শিথিল ক'রে আনে হাত পা, তখন হোটেলের লঙ্কা-আম গাছটার ছায়ায় ব'সে ব'সে এক একদিন ঘুরিয়া ভাবে—কী ওদের জীবন, কী ওর জীবন! এই পরের অনুগ্রহের আশায় ব'সে থাকা, একটা লোক স্নান করতে যাবে বুঝলেই ছুটে গিয়ে টানাটানি—তারপর বকশিশের

জন্যে কী কাঙালপনা ;—এত কাণ্ডের পর সারাদিনে যা উপার্জ্জন হবে কোন মতে দুটি ভাতে আর নেশায় তার সব খরচ করা। থাকে কুকুর বেড়ালের মত—না কুকুর বেড়ালেরও অধম—এই বিলিতি হোটেলের চাকররা যে সুখে থাকে সে সুখ ঘুরিয়া কল্পনা করতেও ভয় পায়—খায় শুধু ভাত, কোনদিন তার সঙ্গে সস্তার একটু মাছ কি ডাল, যেদিন মেলে সেদিন ত ভোজ। পরে এই ছেঁড়া ট্যানা—বড় জোর কোন সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। এ বেঁচে থেকেই বা লাভ কি ?

নেশাই কি মনের মতন করতে পারে ? এক একদিন ইচ্ছে হয় বোতল বোতল মদ খেতে। আগে যখন এই হোটেলেই মদের দোকান ছিল তখন এক একদিন দেখত সাহেবরা চার বোতল পাঁচ বোতল মদ খেয়ে কেমন খুশি থাকত—তেমনি ওরও খেতে ইচ্ছে করে। ভাল ভাল বিলিতি মদ—

না—সে দুরাশা। দিশি মদই এখন গোপনে কিনতে অনেক পয়সা চলে যায়। শালা দেড় টাকার কম একটা বোতল দিতে চায় না কিছুতেই। তার ওপর কি দিয়ে চোলাই করে কে জানে—আজকাল বুকটা বড় জখম হয়ে যায় নেশা করলে। পেটে যেন কী একটা ব্যথা ধরেছে—প্রায়ই ব্যথা করে। তবু সেই টুকুই যেন আশাতীত সৌভাগ্য।

এক এক দিন হোটেলের গুর্খা দারোয়ান রাজবাহাদুর ওকে বলে, ‘কী হয় এত নেশা ক’রে ? নেশা করিস কেন ? ছাড়তে পারিস না !’

রাজবাহাদুর খুব হুঁশিয়ার, ছুটির দিনে শুধু মদ খায় একটু—কিম্বা কাঁচা সুপুরি, অন্য কোন নেশা নেই ওর। মদও নিজের হাতে সে তৈরী করে নেয়।

ঘুরিয়া ভেবেছে রাজবাহাদুরের কথাগুলো।

নেশা ছাড়লে এ জীবন কি একদিনও যাপন করতে পারত ?

তাকে ত মানুষই ভাবে না ওরা—ঐ বড়লোক সাহেব আর নকল সাহেবগুলো। নিজেদের পোষা কুকুরদের যতটা সমীহ করে তার অর্দ্ধেকও যদি করত। বিশেষত ওদের ঐ মেয়েগুলো। কতই বা বয়স ঘুরিয়ার—একদিন ও হিসেব করিয়েছিল হোটেলের খানসামা গোলাম রসুলকে দিয়ে, সাতাশ বছর বুঝি বলেছিল সে—তা যাই হোক্ এখনও পূর্ণ যৌবন ওর, অথচ মেয়েগুলো নিজেদের একটা চোদ্দ বছরের ছেলেকে দেখলে যতটা পুরুষ ভাবে, ততটাও ভাবে না ওকে। পুরুষ! এক একদিন এক একটি যুবতী পূর্ণাঙ্গী মেয়েকে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এর তালে তালে যখন নাচতে থাকে ঘুরিয়া, তার দেহ এক একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় যখন কোন কোন সময় একেবারে ঘুরিয়ার দেহের ওপর এসে পড়ে, নরম হাতগুলো জোর ক'রে ধরে রাখার অছিলায় যখন ঘুরিয়া বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে—তখন যে ঘুরিয়ার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে—সে কথা কি ওরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না? সব চেয়ে আঘাত লেগেছিল ওর সেই দিনই—যেদিন একটি অল্প-বয়সী পাঞ্জাবী মেয়ে ওর সামনে নির্জ্জন বালুবেলায় ভিজে পোযাক ছেড়ে শুকনো পোষাক পরেছিল! পৌরুষের এই দুঃসহ অপমানে সেদিন রাত্রে ঘুরিয়া পাগলের মত মাথা খুঁড়েছে নিজে নিজেই। কী ভাবে ওরা তাকে, সে কি মানুষ নয়, সে এমন কি কোনও জীবও নয়? সে কি পারত না সবল বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে সেই মুহূর্ত্তে তাকে নিষ্পেষিত ক'রে বুঝিয়ে দিতে যে—সেও পুরুষ, সেও তরুণ!

কী কষ্টে যে নিজেকে সামলেছে সে—তা সে-ই জানে।

না—এ জীবন এমনি বহন করা সম্ভব নয়! সজ্ঞানে এই কাজ করা—অসম্ভব। তাই নেশার পর নেশা ক'রে নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

অথচ কীইবা করতে পারত সে?

জাল কেনবার পয়সা থাকলে মাছ ধরত। জাল চাই, নৌকোর কাঠ চাই—অত পয়সা জীবনে চোখেই দেখেনি। এমনি একান্ত রিক্ততার মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে, এমনি নিঃস্বতার মধ্যেই তার জ্ঞান হয়েছে একটু একটু ক'রে। একেবারে কিছুই নেই। একদিন রোজগার না হ'লে সপরিবারে উপোস করতে হয়—ছেলেবেলা থেকেই এটা সহজে মেনে নিয়েছে ওরা।

ভালই হয়েছে বৌটা পালিয়ে গেছে—মনে মনে বলে ঘুরিয়া। আরও অভাব, আরও দুঃখ বাড়ত। অবিশ্যি সেও কিছু কিছু রোজগার করত কিন্তু সে আর কত, এর মধ্যে আরও কতকগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে যেত। এদিক দিয়ে বেশ আছে সে—যেদিন মদ পায় না সেই পয়সাটা বাঁচে কিংবা মদ কিনেও চার ছ' আনা বাঁচে সেদিন হাতের কাছে স্ত্রীলোকের অভাব হয় না।··· না, সে জন্যে তার দুঃখ নেই—দুঃখ শুধু হয় যখন সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে গিয়ে সন্ধ্যায় ভাত রাঁধ্তে বসতে হয় তখনই। বুড়োটা তাও করে না অর্দ্ধেক দিন। ছ' আনার আপিং খেয়ে থুম্ হয়ে ব'সে থাকে এক জায়গায়। সে সব দিনে মারধোর ক'রেও তাকে নড়ানো যায় না।

রিক্সা চালাবে? সেও খাটুনি কম নয়। মন্দির থেকে স্বর্গদ্বার আধ ক্রোশ রাস্তা—তিন আনা। মন্দির থেকে চক্রতীর্থ ছ' আনা—দেড় ক্রোশ পথ ত বটেই। পায়ে আর কিছু থাকে না। সেই দুঃখেই ওরা অত আপিং খায়।

স্টেশনে কুলীর লাইসিন্ পেলে বেঁচে যেত। কিন্তু পাবার উপায় নেই—ঢের চেষ্টা করেছে সে। অত টাকা কোথায় ?

এক পাওয়া যায়—বাড়ীতে চাকরের কাজ। কিন্তু সে বাঁধা জীবন কি আর এখন পারবে কাটাতে ? বোধ হয় না।

পালিয়ে যাবে কোথাও ? কোন চা-বাগানের কাজ মিলবে না ? কলকাতা খুব ভারি শহর সে শুনেছে—সেখানের কোন কারখানায় কি কাজ মিলবে না ? পেটের এই ব্যথাটা— ; থাক্‌গে, তাতে কি ?

সাহস হয় না যেতে। খুব শৈশবে ওদের দেশ ছেড়ে হাঁটাপথে ওরা এখানে এসেছিল, তারপর থেকে আর কোথাও যায়নি, কোন দেশ দেখেনি। যা কাজ ওর বাপ জানত, তাই শিখিয়েছে—সমুদ্র প'ড়ে আছে, উত্তাল তরঙ্গিত—তাইতে জানে সে নাচতে, ঢেউ কাটাতে। সেই সামান্য অভিজ্ঞতারই সামান্য মূল্য পায়। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দু-চার আনা বকশিশ।

কষ্ট হয় খুব বর্ষাকালে। কোন লোক থাকে না—সারাদিনে চার আনা আট আনাও রোজগার হয় না। ঝিনুকও থাকে না বেশি সে সময়—তবু সারাদিন ঘুরে ঘুরে তাই সংগ্রহ ক'রে সন্ধ্যাবেলা পাইকারদের কাছে ওজন দরে বিক্রী হয়—দু আনা এক আনা। তাতে কীই বা হয় ! নেশা করতেও কুলোয় না। অর্দ্ধেক দিনই বাপ-বেটায় উপবাসে কাটায়। সেই সময় এক একদিন মরীয়া হয়ে উঠে ভাবে বিনা টিকেটে না হয় মার খেতে খেতে কলকাতায় চ'লে যাবে। কিংবা কোন সাহেবের কাছে চাকরী নেবে—বাসন মাজা ঘর-ঝাঁট-দেওয়ার কাজ।......

দিবাস্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। উনিশ নম্বর কস্টিউম্ পরে নামছেন। হৈ

হৈ ক'রে ছুটে যেতে হয়। তিনি হয়ত বেছে নেন্ রামস্বামীকে—হতাশ হয়ে ফিরে এসে বসে ঘুরিয়া।

এ বছর বৈশাখ মাস থেকে পেটের ব্যথাটা বড় বেশি জ্বালাচ্ছে। কিসের ব্যথা কে জানে। রাত্রে যেদিন চন্দন যাত্রা দেখতে যায় সেদিন ত নরেন্দ্র সরোবর থেকে ফেরবার সময় পথেই শুয়ে পড়তে হয়েছিল ওকে। তার পর থেকে প্রায়ই একেবারে শয্যাশায়ী ক'রে ফেলে।

এক্কলস্বামী বলেছিল, 'লিবারের ব্যথা। যা সব বাজে মাল দেয় তোর শালা মদের সঙ্গে। ওতেই লিবারে ঘা হয়েছে।'

শেষে হাসপাতালেও গিয়েছিল একদিন। তারা বলেছিল মদ ছাড়তে। মদ গাঁজা দুই-ই ছাড়তে হবে। কিন্তু কোনটাই হয়ে উঠেনি।

আষাঢ় মাস থেকে রক্ত পড়তে শুরু হ'ল। মুখ দিয়ে—মলের সঙ্গেও। এক্কলস্বামী নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'পেটে তোর ঘা হয়ে গেছে—আর তুই বাঁচবি না।'

ঘুরিয়া গালাগালি দিয়ে উঠেছিল সেদিন, ক্ষমতা থাকলে মেরেও বসত হয়ত। 'আমি মলে তুই বাঁচবি কি ক'রে? খাবি কি?'

'ভগবান দেবে। কত লোকের ছেলেরা ত খেতে দেয় না—তারা খায় কি ক'রে?' সে বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতেই। সে যেন খুশীই হয়েছে ছেলের এই অবস্থায়।

এখনও যাত্রী আসছে। রথ শেষ হয়নি। এই হ'ল রোজগারের সময়। দুদিন বাদেই একেবারে নির্জ্জন হয়ে যাবে সব, পথ-ঘাটে পর্য্যন্ত লোক দেখা যাবে না। রোজগার বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। প্রাণপণে উঠে আসে ঘুরিয়া কিন্তু

সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যোঝবার বল যেন আর নেই ওর, মাথা ঘোরে, হাতের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে আসে। বিপদ ঘটতে পারে হাত খুলে গেলে, তাদের হাতে এত জোর নেই যে তারা ধ'রে রাখবে।

হাসপাতালে আর একদিন গেল। ডাক্তারেরা দেখে শুনে বললেন, 'ক্যান্‌সার!'

'সে কী রোগ বাবু?' ঘুরিয়া বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'সে সারবার রোগ নয়। অনেক পয়সা খরচ করলে কি কলকাতায় গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হ'লে সারতে পারে।'

ঘুরিয়া হামা টেনে টেনে বাড়ী ফিরল বলতে গেলে, মনের জোরের সঙ্গে পায়ের জোরও গেছে। কিন্তু এখানেই জ্বালার শেষ নয়, বাড়ীতে গিয়ে দেখলে ওরই চ্যাটাইয়ের ওপর চুপ ক'রে শুয়ে আছে ওর বৌ। পাঁচ ছ' বছর পরে আবার কালামুখ নিয়ে ফিরে এসেছে। সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো কেউ নেই। বোধ হয় যমের দোরেই দিয়ে এসেছে—কে জানে!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল ঘুরিয়ার, সে নিঃশব্দে গিয়ে রান্নার জন্য রাখা একটা চেলাকাঠ নিয়ে বসিয়ে দিলে এক ঘা। বৌটা হাউ মাউ ক'রে উঠে বসল। কান্নাকাটি করলে। তারপর বললে, দুটো দিন জায়গা চায় সে, দুদিন পরে কোথাও চলে যাবে।

ততক্ষণে ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছে ঘুরিয়া। শুধু প্রশ্ন করলে, 'সেগুলো কোথায়?'

'ছেলে দুটো মার খেয়ে খেয়ে পালিয়ে গেছে। মেয়েটা মরেছে।'

'কে মারত? সেই শালা?' রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠল ঘুরিয়ার। কতই বা বয়স তাদের, এখন সাত আট হবে হয়ত। কোথায় পালাল

কে জানে। হয়ত চা-বাগানে ধ'রে নিয়ে গেছে, কিংবা মরেই গেছে। মরুক্ গে—সে-ত নিজেই মরতে চলেছে—

'এই, ভাত রাঁধতে পারবি ?'

'পারব। চাল আছে ?'

'না। কিনে আন। পয়সা নিয়ে পালাবি না ত ?'

'ভারি ত পয়সা।'

বউ ভাত রাঁধে, খায়। ঘুরিয়াকেও খাওয়ায়। তারপর পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুরিয়ার রোগের বিবরণ শোনে। রাত্রে পাশাপাশিই শোয়—নইলে স্থান কোথায় ? এঙ্কলস্বামী আসে না সে রাত্রে। কোথায় হয়ত নেশা ক'রে পড়ে আছে। ছেলের অবস্থা দেখে বুঝেছে রান্না ভাত আর পাবার আশা নেই।

বৌটা থেকেই যায়। ঘুরিয়া আর উঠতে পারে না একেবারে। পয়সা নেই, কেউ ধারও দেবে না। ঘুরিয়া আর ভাবে না, সে হাল ছেড়েই দিয়েছে। বৌটা কোথা থেকে মধ্যে মধ্যে যোগাড় ক'রে আনে—ছুটি চাল কিংবা পকাড়—পান্তা ভাত। ভিক্ষেই ক'রে বোধ হয়। নইলে কে ওকে দেবে। খাটবার সময় নেই, কাজই বা কি জানে! অন্য রকমে ? না—সে চেহারা আর ওর নেই। এককালে ছিল বেশ গোলগাল। এখন ত কঙ্কালসার।

তা বৌটা সেবা করে খুব। কেন যে এল, কোথা থেকে এল—ভেবে পায় না ঘুরিয়া, ভাবতেও চায় না। জগন্নাথের দয়া ধ'রে নিয়েছে সে।

ঝুলনে ছুচার জন লোক এসেছিল কিন্তু ঘুরিয়া একেবারেই উঠতে পারে না। মধ্যে মধ্যে সে শুধু মিনতি ক'রে বলে বৌকে, 'আমাকে একটু ধ'রে ধ'রে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবি ?'

'কেন, কি হবে?' অবাক্ হয়ে যায় সে, 'সে যে অনেকখানি পথ।'

'তবে থাক্।' অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'কী জানিস্—ঐ আমাদের রোজগারের জিনিস, ঐ আমাদের সব। নোনাজল ছাড়া আমরা কি থাকতে পারি? বড় কষ্ট হয়।'

বৌ ব'সে ব'সে পায়ে হাত বুলোয় আর বলে, 'তুই একটু ভাল হ—আর একটু জোর পেলে যাস্। আমাকে ধ'রে ধ'রে যাস্ বরং—'

ভাল! ভাল কী আর হবে?

হাসপাতালেই যেতে পারে না সে। ওষুধও আসে না। অসহ্য যন্ত্রণা পেটে। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায়—তখন কেমন যেন মনে হয় ওর বাপ ডাক্‌ছে, 'ওঠ ওঠ, বেলা হয়ে গেছে ঢের—'

চম্‌কে চোখ মেলে দেখে। কান পেতে শোনে সমুদ্রের গর্জ্জন।

বৌকে ডেকে বলে, 'শোন্—যদি আর নাই বাঁচি একটা কথা শুনে রাখ্। মরবার আগে একটু মদ খাওয়াস্ একদিন। আর শেষ সময়ে যেমন ক'রেই হোক একবার ধ'রে ধ'রে কি টেনেটেনেও নিয়ে যাস সমুদ্রের ধারে—'

বৌ উত্তর দেয় না। কদিন চাল নেই। ভিক্ষেও মেলেনা। সমুদ্রতীর জনহীন। এঙ্কলস্বামী কোথায় সরে পড়েছে, কোন্ ভাইঝি-জামাইয়ের কাছে গিয়ে উঠেছে নাকি। মরণাপন্ন রোগীকে ফেলে খাটতেও যেতে পারে না সে।

পারবে কি বাঁচিয়ে রাখতে পূজো পর্য্যন্ত? তখন হয়ত আবার বাবুরা আসবে। কিছু পয়সা পেলে রিক্সায় বসিয়ে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে পারে!

অতদিন কি বাঁচবে? কে জানে—এখনও প্রায় দেড়মাস।

মনে মনে হিসেব করে সে।

বিষয়

বুড়ী গহ্বরের মত দন্তহীন মুখখানা হাঁ ক'রে নিঃশব্দে হাসে। খাইমুখ খুবই ছোট, পাৎলা পাৎলা ঠোঁট—তাই মাড়ি দেখা যায় না—শুধু একটা অন্ধকার শূন্যতা। হাসে প্রাণখুলেই, কিন্তু আওয়াজ হয় না। অনেকক্ষণ এমনি হেসে নিয়ে বুড়ী বলে, 'এ আবার একটি, কুকুরের মত গন্ধে গন্ধে এসেছে। চিল শকুনে ভাগাড়ে মড়া দেখলে ছুটে আসে, এদের দেখতে হয় না, গন্ধ শুঁকেই এসেছে।'

'আর সেটি? গতবছর পর্য্যন্ত যাকে দেখে গিয়েছিলুম? গোব্‌রা?'

'পালিয়েছে।'

আবার তেমনি নিঃশব্দ হাসি। দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা চাতুর্য্য ফুটে ওঠে হাসির সঙ্গে।

হাসি থামলে আমার দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলে, 'বিষয়! বিষয়ের লোভে ছুটে আসে! আরে হতভাগারা আগে বিষ, তারপর বিষয়। বিষ সহ্য কর্‌তে পারবিনি—অম্‌নি অম্‌নি বিষয় ভোগ করবি? জানু বাম্‌নি সে মেয়ে নয়!'

আবার হাসি।

'দিন কতক আদাজল খেয়ে এইসা পিছনে লাগলুম, পালাতে পথ পেলেনা। সব ব্যাটা এসেই আগে বলে—তোমার জন্যে বড় মন কেমন করে, তাই এলুম, আহা বুড়োমানুষ একা একা থাকো—দেখাশুনো করবার

ত একটা লোক চাই। আ মর্, দেখাশুনো করার লোক চাই সে কথা কি আমি জানিনি, তোদের ভরসায় ব'সে আছি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি! কী বলো নাতি? বামুনের মেয়ের অভাব আছে কাশীতে? একটা যাচ্ছে আর একটাকে রাখছি। রাঁধে, বাজার করে, বাসন মাজে আবার সন্ধ্যেবেলা গা-হাত টিপে দেয়। খোরাক-পোষাকে মাইনে—কে না আসবে! আর ওঁরা, এসে ইস্তক্ বেড়ালের মত ছোঁক্ ছোঁক্ করেন কখন কী হাতাতে পারেন!'

'কিন্তু ঝি চাকররাও ত মেরে পালাতে পারে।' একটু থেমে প্রশ্ন করি।

'পাগল নাকি! আমি জেগে থাকতে? এখনও এক চড়ে তোর মত জোয়ানকে শুইয়ে দিতে পারি। আর ঘুমন্ত? লোহার খিল ক'রে নিয়েছি দোরে—চাপা মজবুত ছিট্‌কিনি। ঘরের সঙ্গে কলঘর করিয়েছি কি অম্‌নি? দোর বন্ধ ক'রে শুলেই নিশ্চিন্তি!'

আবার সেই নিঃশব্দ হাসি আর দৃষ্টিতে অপরিসীম ধূর্ত্ততা!

একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'এমনি মেরে ফেলে ঝি চাকরের ত লাভও নেই। খুচরো বিশ-ত্রিশের বেশি ঘরে রাখিনা। সব ব্যাঙ্ক না হয় পোস্ট আফিসে। সে আমি খুব সেয়ানা—নতুন ঝি চাকর এলেই বাক্সপ্যাটরার চাবি যেখানে সেখানে ফেলে রাখি। ইচ্ছে থাকে বাক্স খুলে দেখুক কি আছে না আছে। যায় অন্নের ওপর দিয়ে যাক্। না না নাতি, ভয় এদেরই। মরে গেলে বিষয় এদেরই অশাবে—ঝি চাকররা ত আর মালিক হবে না। তাছাড়া এক বাড়ী ভাড়াটে—কেউ চট ক'রে পালাতে পারবে না।'

মান-সরোবরের এই বিরাট বাড়ী, এছাড়া বাঁশফট্‌কায় একটা, গৌরীগঞ্জে

একটা। আরও কোথায় কী করেছে কে জানে। এই এক নেশা বুড়ীর—একটা বেচে আর একটা তৈরী করে। মুনাফা পায় ত বেচে, নইলে ভাড়া দেয়। লোকসান নেই কোন দিকেই। নতুন তৈরী করা ছাড়াও—পুরোনো বাড়ী কেনে জলের দামে। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে মেরামত করে, হয়ত একটা দেওয়াল পালটে দিলে কিংবা একটা থাম—মানে যেগুলো খুব প'ড়ো-প'ড়ো। তারপর চুণ ফিরিয়ে রং ক'রে যখন নতুনের মত হয়ে যায় তখন মোটা লাভে বেচে। এই ব্যবসা, এই জীবিকা।

চম্‌কে ওঠবার কথা কিন্তু এইটেই সত্য।

ব্রাহ্মণের বিধবা, আঠারো বছর বয়সে তিন বৎসরের শিশু পুত্র নিয়ে বিধবা হন। জ্ঞাতিদের বাড়ী ঝিয়ের মত খেটে, ছেলে মানুষ করতে হয় তাঁকে। শ্বশুর বাড়ীতে যে কিছু ছিল না তা নয়—জমি-জমা হয়ত তাঁদের ভাগেও কিছু পাবার কথা কিন্তু সে ভাগ ক'রে দেয় কে? তাছাড়া বুদ্ধিটা তাঁর বরাবরই তীক্ষ্ণ, তিনি বেশ জানতেন যে ও জমি-জমা নিজে দেখে তার আয় থেকে সংসার চালানো মেয়েছেলের সাধ্য নয়। বিশেষত পাড়াগাঁয়ে অল্পবয়সী মেয়েছেলে এ সব কাজ ক'রে বেড়ালে তখনকার দিনে বিষম নিন্দা হ'ত। সুতরাং সে চেষ্টা না ক'রে তিনি একাধারে ঝি এবং রাঁধুনি হয়ে ভূতের মত খাটতে লাগলেন। কারোর কোন লাঞ্ছনা এবং অনাদরই গায়ে মাখতেন না। স্বাস্থ্য ছিল ভাল, কখনও অসুখ করত না ব'লে বাড়ীর অপর স্ত্রী-লোকেরা সমস্ত সংসার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কেবল একটি বিষয়ে ভদ্রমহিলা কঠিন ছিলেন। সেটা হচ্ছে তাঁর ছেলের ব্যাপার। ওঁর ছেলেকে পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া শেখাতে হবে—কাকা-জ্যাঠার এ কল্পনা ছিল না কোন কালেই। কিন্তু তিনি জোর ক'রে ইস্কুলে

পাঠালেন এবং এ নিয়ে একটু কথা উঠতেই একদিন মাথায় ঘোমটা টেনে ভাস্থরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠেই শুনিয়ে দিলেন, 'আমার ছেলেরও হিস্তে আছে এ সংসারে সেটা আমি জানি। এই জমি-জমার আয়েই আপনাদের রাবণের গুষ্টি খাচ্ছে—আমার ত একটা ছেলে। এই নিয়ে গোলমাল করবার ইচ্ছে আমার নেই ব'লেই মুখ বুজে দাসীবৃত্তি ক'রে যাচ্ছি। গোলমাল যদি করতেই হয় ত কারুর চেয়ে কম করব না জেনে রাখবেন !···কড়া-ক্রান্তি পাই-পয়সা বুঝে নেব, তা ব'লে দিলুম।'

ভাস্থর ওঁর এই স্পর্দ্ধায় অবাক্ হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'একটা ছেলে নিয়ে ঘর করো বৌমা, তোমার সাহস ত কম নয়।'

'একটা ছেলের যদি কোন অনিষ্ট হয় ত—দশটা ছেলে দিয়ে শোধ তুলতে আমি জানি। ঘরে আগুন দিয়ে ঘুমন্ত পুড়িয়ে মারলে ধাড়ী বাচ্ছা এক ঘণ্টাতেই কাবার হবে। আমাকে ঘাঁটাবেন না—ছেলের লেখাপড়া কাপড়-জামা খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হ'লে রক্ষা রাখব না ব'লে দিলুম।'

সে কণ্ঠস্বরে ভাস্থর দেওররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

ভয় পাবার আরও কারণ ছিল। ছেলের দোষ দেখে শাসন করলে তিনি কাউকে কিছু বলতেন না—কিন্তু একদিন তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এক দেওর বিনা দোষে ছেলেকে একটা লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। রান্নাঘর থেকে তাই দেখে সটান বেরিয়ে এসে সেই লাঠি কেড়ে নিয়ে এমন এক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন দেওরের কাঁধে যে তিনি তিন দিন ব্যথায় উঠতে পারেন নি।

সেই থেকে গ্রামে তাঁর নাম রটে গিয়েছিল 'খুনে বৌ' কিন্তু আর কখনও কেউ তাঁকে ঘাঁটাতেও সাহস করেনি।

সেই ছেলে, পাঁচ ঠাকুরের দোর-ধরা পাঁচুগোপাল, এক সময় এনট্রান্স

পাস ক'রে কলেজে পড়তে গেল, কলকাতায়। বড় কর্ত্তা সে সময়ও এক-বার আপত্তি তুলেছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'বৌমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো কল্‌কাতায় থেকে কলেজে পড়বার খরচাটা আসবে কোথা থেকে ?' তার উত্তরে 'বৌমা' রান্নাঘর থেকে বেশ চেঁচিয়েই বলেছিলেন, 'বট্‌ঠাকুরকে বলবেন যে পাঁচুর জাঠতুতো ভাইয়ের পড়ার খরচটা যেখান থেকে আসছে সেইখান থেকেই আস্‌বে। বট্‌ঠাকুর ত আলাদা কিছু রোজগার করেন না—পৈত্রিক জমি-জমা থেকেই খান্।···তবে আবার খরচের কথা তোলেন কোন্ লজ্জায় ?'

কিন্তু এফ্-এ ফেল ক'রে পাঁচুগোপালের জাঠতুতো দাদা যখন ফিরে এসে দেশে বস্‌ল তখন কিছুতেই পাঁচুর খরচ ওর জ্যাঠা আর দিতে চাইলেন না। সে তখন ডাক্তারী পড়ছে, আর দুবছর পরেই পাশ করার কথা। পাঁচুর মা দেখলেন জ্যাঠা কাকা সব একদিকে। বাড়ীর কোন ছেলেই লেখাপড়া করে না। সরস্বতীর সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক সকলের। সে ক্ষেত্রে ওর জন্য পয়সা খরচ করাটা বাজে খরচ ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি এবার বুঝলেন যে আর ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। তিনি তখন প্রস্তাব করলেন যে তাঁর ছেলের আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে, তার সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া হোক্—তাঁরা বেচে কিনে চ'লে যাবেন। গ্রামের মাতব্বরদের ডাকা হ'ল। কিন্তু যে বেচে কিনে চ'লে যাবে তার চেয়ে যারা থাকবে এবং যাদের সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে তাদের দিকে টান বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। হ'লও তাই—বিচারে স্থির হ'ল যে তাঁর তিন জ্ঞাতি তাঁকে এক্কুনে ন'শ টাকা দেবে, তারই বদলে ওঁরা শ্বশুরের বিষয়ের ওপর সমস্ত দাবী ছেড়ে দিলেন, এই রকম দলিলে সই করবেন, মা ছেলে দুজনেই।

জাহ্নবী ভয় পেলেন না—সই করতে তাঁর হাত কাঁপল না। সেই টাকার ওপর ভরসা ক'রেই ছেলের সঙ্গে কলকাতায় এলেন। টাকাটা পোস্ট আফিসে জমা ক'রে ছেলেকে ব'লে দিলেন, 'ঐতেই তোর খরচা চালা, আমার জন্য ভাবিস্‌নি।'

তারপর তিন বৎসর তিনি যুদ্ধই করেছেন বলতে গেলে। নিজে একবাড়ীতে রাঁধুনির কাজ নিয়েছিলেন, তাতে খাওয়া পরা চললেও নগদ টাকা বিশেষ হ'ত না। অগত্যা রাত জেগে খুঞ্চেপোশ আর লেস্‌ বুনে দুপুরবেলা বিশ্রামের সময়টা ঘুরে ঘুরে তা বিক্রী করতেন। পরীক্ষা দেবার পরও ছেলের খরচ কিছুদিন চালাতে হবে তা তিনি জানতেন—সেই জন্যেই এই তপস্যা তাঁর।

ডাক্তারী পাস করার পর পাঁচুগোপাল ভাল চাকরী পেলে কোন্‌ এক বিলিতি মার্চেন্ট আফিসে। ভাগ্য ফিরল জাহ্নবীর। কলকাতায় বাড়ী ভাড়া ক'রে ফার্ণিচার কিনে বাড়ী সাজিয়ে একদিন মাকে নিয়ে এল সসম্মানে, রাজরাণী ক'রে। পাগল ছেলে ঝি আর রাঁধুনী পর্য্যন্ত রেখেছিল—উনি এসে রাঁধুনিকে তাড়ালেন। ছেলেকে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তোকে পরের হাতে খেতে দেব কেন? ঢের দিন ত মেসের খাওয়া খেয়েছিস্‌।'

ছেলে উপার্জ্জনের সব টাকাই তাঁর হাতে তুলে দিত। মাইনে ছাড়াও উপার্জ্জন ছিল তার। চাকরী পাবার পরই বিয়ে দেবার জন্য জাহ্নবী উঠে পড়ে লেগেছিলেন কিন্তু পাঁচু এই একটি ব্যাপারে মায়ের কথা শোনেনি। বলেছিল, 'দাঁড়াও মা, আগে একটা বাড়ী করি। দেশের বিষয় থেকে কাকারা বঞ্চিত করলেন যেদিন, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা, আগে ভূসম্পত্তি না ক'রে বিয়ে-থা করব না।'

জাহ্নবী এক বৎসরের মধ্যেই টাকা জমিয়ে কালিঘাট অঞ্চলে সস্তায় জমি কিনলেন, প্ল্যান হ'ল, বাড়ী শুরু হবে, ইটকাঠ পর্য্যন্ত বায়না হয়ে গেছে —এমন সময় তিনদিনের জ্বরে পাঁচুগোপাল মারা গেল। মরবার কয়েক মুহূর্ত্ত আগেও বিহ্বল চক্ষু মেলে মাকে প্রশ্ন করেছিল, 'মা, বাড়ীর কত বাকী ?'

এই আঘাতে ভেঙ্গে পড়ারই কথা। ভেঙ্গেও পড়েছিলেন জাহ্নবী, প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ একদিন এরই মধ্যে স্বপ্ন পেলেন, ছেলে যেন তাঁকে বলছে, 'তুমিও ভেঙ্গে পড়লে মা, তবে আমার বাড়ীর কি হবে ?'

সেইদিন থেকে তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরল, ছেলের কাজ বাকী আছে— শেষ করতে হবে তাঁকে। কিন্তু টাকা কোথায় ? কি দিয়ে বাড়ী করবেন। যা সামান্য হাতে ছিল তা ত শ্রাদ্ধেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি কি খাবেন সেই সংস্থানই নেই, তা বাড়ী !

আকাশ পাতাল ভাবছেন এমন সময় ছেলের আফিস থেকে এক সাহেব এসে তাঁকে ডেকে নগদ দু' হাজার টাকা গুণে দিয়ে গেল। সঙ্গে যে বড়বাবু ছিলেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে জাহ্নবী দেবীর অসহায় অবস্থা বুঝে কোম্পানী থেকে এই টাকা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে।

এ যেন দৈবের ইঙ্গিত। অন্ততঃ জাহ্নবী দেবী তাই মনে করলেন। তিনি এ বাসা উঠিয়ে আসবাবপত্র বেচে কালিঘাটে একটি অন্ধকার কুঠরিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তখনকার দিনের পুরললনাদের যা কল্পনার অতীত ছিল তাই করলেন—নিজে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটিয়ে বাড়ী তৈরী শেষ করলেন। প্রথম প্রথম কিছু জানতেন না ব'লে একটু-আধটু ঠকেছিলেন কিন্তু তারপরই

সবটা আয়ত্ত ক'রে ফেললেন—তখন আর মিস্ত্রীদের ফাঁকি চলল না। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তারা প্রকাশ্যেই ওঁর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে গেল।

ছোট একতলা বাড়ী। তারই অর্দ্ধেকটা ভাড়া দিয়ে একখানা ঘরে উনি এসে উঠলেন। বাকী জীবনটা গঙ্গাস্নান এবং পূজাব্রত নিয়ে কাটাবেন এই ছিল ইচ্ছা।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য। তাই হঠাৎ একদিন এক খদ্দের এল।

'এ বাড়ী বিক্রী করবেন?'

'না' বলতে গিয়েও জাহ্নবীর কী মনে হ'ল—বললেন, 'ভাল দাম পেলেই করব।'

'কত নেবেন বলুন। আমাদের এখনই চাই—কাজেই দু একশ' বেশী দিতে আপত্তি নেই।'

জাহ্নবীর জমিসুদ্ধ খরচ পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা। উনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'পাঁচ হাজার পেলে বিক্রী করব।'

আর একটু টানাটানির পর চার হাজার আট শতে ওরা রাজী হ'ল।

জাহ্নবী বায়নার রসিদ লিখে দিয়েই পাড়ায় ঘুরতে বেরুলেন। দিন-তিনেক খুঁজেই একটা অপেক্ষাকৃত বড় পুরানো বাড়ী বায়না করলেন—চার হাজার টাকা দাম ঠিক হ'ল। সে বাড়ী সারিয়ে রং ক'রে মাসকতক পরে বেচলেন সাত হাজারে।

এই শুরু হ'ল। তারপর যে কত বাড়ী করিয়েছেন এবং কিনেছেন, আবার লাভে বেচেছেন তার ঠিক নেই। জমিও কিনেছেন, বালিগঞ্জ অঞ্চলে চার শো টাকা কাঠা জমি কিনে তেরশো টাকায় বেচেছেন। সেই জমিই আবার কিনেছেন উনিশ শো টাকায়, বেচেছেন তিন হাজারে।

এই নেশায় পুত্রশোক ভুলেছেন। শুধু অনেক বয়স হ'তে কলকাতার পাট তুলে কাশী এসেছেন। কিন্তু এখানেও ব্যবসা বন্ধ থাকেনি। শুধু এই মান-সরোবরের বাড়ীটা বেচেন নি, মনের মত ব'লে। বলেন, 'আর এখন ওঠাউঠি করতে পারি না, বয়স হচ্ছে ত!'

এখন যে-কোন ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়ী করা শিখিয়ে দিতে পারেন। ড্রাফ্ট্স্ম্যানকে ডেকে নিজে প্ল্যান এঁকে দিয়ে বলেন, ঠিকমত কালি বুলিয়ে দিতে। কোন্ মাপের ঘর হবে জানলে, কত ইট এবং কত চুণ-স্থরকী লাগবে তার নির্ভুল হিসেব ব'লে দিতে পারেন মুখে মুখে। খাটতেও পারেন এখনও। নিজে গিয়ে মিস্ত্রী খাটান, রাত্রে ফিরে হিসেব নিয়ে বসেন। টাকা পয়সার হিসেব, ব্যাঙ্কের স্থদ, বাড়ী ভাড়া—হাজার রকমের হিসেব তাঁর। খাতাপত্র ফাইল—দস্তুরমত আফিস যেন। এখনও চলেন সোজা হয়ে, রাত্রে লুচি ও দুধ খেয়ে হজম করেন—গায়ের জোর যে কমেনি তা ত স্বচক্ষেই দেখেছি, জোয়ান হিন্দুস্থানী মজুর একটা উদ্ধতভাবে কি কথা বলেছিল—এমন টেনে চড় মারলেন যে সে সাত হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। সকলে স্তম্ভিত হয়েছিল ওঁর ঐ কাণ্ড দেখে। সে যেদিনের কথা বলছি তখন বয়স ছিল ওঁর সাতাশি—এখন নব্বুই হয়ে গেছে।

ওঁর যে জ্ঞাতিরা দুঃখের দিনে তাড়িয়ে দিয়েছিল বিষয়ে বঞ্চিত ক'রে, দুঃসময়ে তারা যে কেউই খোঁজ নেয়নি তা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিষয়ের গন্ধ কি ক'রে ঠিক গিয়ে পৌঁছল। স্থসময়ে একে একে সবাই আসতে শুরু করলে, খুঁজে খুঁজে।

আমি বলেছিলুম একদিন, 'তখনই তাড়িয়ে দেননি কেন?'

বুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'পাগল। তা হ'লে আর জব্দ করলুম কি? বিষয়ের লোভে এসেছে, থাক দুদিন। আগে হুল ফোটাই তবে ত মধু। বাড়ীতে রেখে দু পায়ে থেঁৎলে দুটি ক'রে খেতে দেব। মনে মনে গজরাবে, অথচ মুখে কিছু বলতে পারবে না। মাথা হেঁট ক'রে লাঞ্ছনার ভাত খাবে —তাতেই ত শোধ উঠবে আমার!'

চোখ দুটো প্রতিহিংসার আনন্দে চক্‌চক্‌ ক'রে উঠেছিল বুড়ীর।

আজও তেমনি চক্‌চক্‌ করছে।

বললেন, 'ইটি আমার ছোট দেওরের মেজ ছেলের ছেলে। ছোট দেওর নিজেই এসেছিল বৌঠাকরুণের খবর নিতে—বছর দেড়েক ছিল আমার কাছে। সে কী মাথা-ব্যথা দিন কতক। বৌঠাকরুণ জল খাবার খান, বৌঠাকরুণ আপনার পিত্তি পড়বে। বৌঠাকরুণ রোদে ঘুরবেন না মাথা ধরবে। বৌঠাকরুণ একটু বিশ্রাম করুন। তারপর যখন আর আমার বাক্যবাণ সহ্য হ'ল না তখন রাক্ষুসি ডাইনি ব'লে গাল দিয়ে চ'লে গেল একদিন। তাও ত নাতি স্নুধুই বাক্যবাণ—খাবার কষ্ট আমি দিইনে তাত জান। মায় কাপড়-জামাও কিনে দিয়েছিলুম। আগে আগে দু একজনকে যত্নও করেছি। আমার বড় ভাসুরের ছেলে পা দুটো ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিল, আপনি ছিলেন বাড়ীর লক্ষ্মী, আপনাকে তাড়িয়ে বাড়ী থেকে লক্ষ্মী চ'লে গেল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন—এই সব কত কি।··· একটু মনটা টলেছিল বৈকি। তারপর ভগবান বুদ্ধি দিলেন, ভাবলুম বাজিয়ে দেখিনা। ওমা টোকা মারতেই ধরা পড়ল—ফাটা হাঁড়ি সব কটা।'

একটু থেমে নিঃশব্দে হাসলেন খানিকটা। আবার বলতে শুরু

করলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম ছোট দেওরের কথা। যাবার সময় ব'লে গিয়েছিল রেখে দে তোর বিষয়। আমার বংশের কেউ কোনদিন অমুক করতেও আসবে না এ বাড়ী। ওমা, বছর তিনেক পরেই খবর পেলুম সেটা টেঁসেছে। ওদের সংসার চলে না এমন দুরবস্থা। বড় ছেলেটা কেঁদে কেটে চিঠি লিখলে, শ্রাদ্ধের খরচ ব'লে একশ'টা টাকাও পাঠালুম। দিনকতক পরে সে মূর্ত্তিমান নিজেই এল—ইয়া পিলে-লিবার, ম্যালেরিয়ায় মরমর। নিজে শুধু নয়, পরিবার ছেলেপিলে সুদ্ধ নিয়ে হাজির। যতটা পারলুম করলুম। মড়ার দশা হয়েছিল, হাজার হোক স্বামীর জ্ঞাতি, ছেলের ভাই—রোগের সময় দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু ভাল হতেই নিজমূর্ত্তি ধরলুম। যদি বুদ্ধি থাকত কৃতজ্ঞতা থাকত ত সেটা সয়ে যেত—কিন্তু তিন দিন মুখ ছোটাতেই বৌটা তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফিয়ে একেবারে চৌকাঠের বাইরে চ'লে গেল। পেছু পেছু সুড় সুড় ক'রে ছোঁড়াটাও। আপদ গেল ব'লে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে পেছনে গোবরছড়া দিলুম। তারপর এল ওর বড় ছেলে; সেজ দেওরের একটাই ছেলে, সেও দিনকতক চার ফেলে গেল। তুমি যাকে সেবার দেখে গেলে গোব্‌রা, সে হ'ল আমার ভাসুরের নাতি। ওদের বংশে যারা আমার বিষয় টেঁকেছিল তারা প্রায় সবাই টেঁসেছে। সবাই ভাবে বুড়ী আর ক'দিন, আরে তোরা ক'দিন তাই ছাখ। এখন আছে ঐ গোব্‌রা, এই কানু—আর দুটো। শুনেছিস্ নাতি, ওরা নাকি আমার বিষয় দেখিয়ে বিয়ে করে, মেয়ের বাপ দুটো তিনটে এসে খোঁজ ক'রে গেছে; এম্‌নি ত একে মুখ্‌খু তায় অষ্টোভক্ষধনুর্গুণো অবস্থা—দেখে শুনে কি ভাল মেয়ে দেয়? আমায় বলে তুমি কি ওদের বিষয় দেবে? তাহ'লে আমরা মেয়ে দিই!'

'আপনি কি বলেন তাতে ?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

'আমি বলি বিষয় ত অনেক পরের কথা। তার আগে বিষ কিনে দিচ্ছি, নিয়ে গিয়ে মেয়েকে খাওয়াওগে। অমন পাত্তরে দেওয়ার চেয়ে আফিং খাইয়ে মেরে ফেলাও ভাল।'

নিঃশব্দ হাসি খানিকটা। তেম্‌নি কৌতুকপূর্ণ, তেম্‌নি চতুর।

পাতানো সম্পর্ক। তবু একটা স্নেহের স্বর বাজে বুড়ীর কণ্ঠে—তাই মাঝে মাঝে আসি। এবারেও পূজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। পৌছেই স্নানটান সেরে দিদিমার ঘরে ব'সে গল্প করছি। সামনেই গঙ্গা, বর্ষার পরিপূর্ণতা না থাকলেও যৌবন একেবারে যায়নি। খরস্রোতে বয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি। বাড়ীটা এমন ভাবেই তৈরী যে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকলে সামনের বাড়ী ঘাট কিছু নজরে পড়ে না, মনে হয় ঠিক এই বাড়ীর নিচে দিয়েই গঙ্গা বয়ে চলেছে।

সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, হঠাৎ কানের কাছে তীক্ষ্ণ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠ বেজে উঠলো, 'বলি বাজার করতে গিয়ে কোথায় এতক্ষণ আড্ডা মারা হচ্ছিল নবাব পুত্তুরের? ইয়ার-বক্‌সি জুটেছে বুঝি এরই মধ্যে? বিড়ি তামাক চলছে?'

চেয়ে দেখলুম সতেরো আঠারো বছরের ছেলে একটি। ঘর্মাক্ত-কলেবরে এক পুঁটুলি বাজার এনে নামাচ্ছে। বুঝলুম এইটিই কাঙ্গু। সে ভয়ে ভয়ে বললে, 'এই ত গেছি ঠাকুমা। এখনও এক ঘণ্টা হয়নি। এতটা পথ সেই দশাশ্বমেধ যাওয়া—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। বাজার কোথায় আমাকে শেখাতে হবেনা। আমি ঘড়ি ধ'রে আধ ঘণ্টায় ফিরে আসতে পারি বাজার ক'রে। তবু ত আমি নব্বুই বছরের বুড়ী, আর তুই সাজোয়ান ছোক্‌রা।'

'কী জানি। আমি ত জোরে জোরেই গেছি এসেছি—'

'ফের কথার ওপর কথা! জুতো মেরে তাড়িয়ে দেব এখনি। রাস্তার কুকুর, কুকুরের মত থাকবি। তোর মত কুকুর তাড়াতে লাঠি লাগে না, লাথিই যথেষ্ট।'

আমারই বাড়াবাড়ি মনে হ'ল এটা। কানুর মুখ এমনিই যথেষ্ট লাল হয়েছিল, এখন যেন জবাফুলের মত টকটকে হয়ে উঠল। একবার করুণ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করলে সে।

'নাও, আগে হিসেব পত্তর দাও। দেখি ক' পয়সা চুরি করলে। হিসেব ঠিক বুঝিয়ে দেবে জানি। এতক্ষণ কি আর বৃথা গেছে, কোথাও কারুর রকে ব'সে কি আর হিসেব মিলিয়ে আসোনি। ওসব আমি জানি। তবুও চুরি ঠিক বুঝব।'

কানু যা হিসেব দিলে, তাতে আমার অভিজ্ঞতায় চুরি সে এক পয়সাও করেনি কিংবা করলেও ঐ একপয়সা পর্য্যন্তই দৌড়। কিন্তু সে কথা দিদিমাকে কে বোঝাবে? তিনি একেবারে ব'লে বসলেন, 'সাড়ে চার আনা মেরেছ দেখছি। দু বাণ্ডিল বিড়ি আর এক কাপ চা। হুঁ।'

কী সর্ব্বনাশ! একটাকা সাড়ে চার আনায় সাড়ে চার আনা চুরি! দিদিমা কি পাগল!

প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিলুম। বুঝলুম যে এটাই ওঁর পরীক্ষা। কানুর সহিষ্ণুতাকে সহ্যের শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে চান।

বিকেলের দিকে কানুকে নির্জ্জনে পেলুম। পথ চিনি না এই অজুহাতে আমিই দিদিমাকে ব'লে ওর ছুটি মঞ্জুর করালুম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে পড়েই কানু যেন ফেটে পড়ল, 'দেখলেন ত বিনা অপরাধে কী অপমানটা করলেন উনি। মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে।'

আমিও কথাটা সকাল থেকেই ভাবছি, সেই ভাবনারই প্রতিধ্বনি করলুম, 'এমন ক'রে কি পারবে? কতদিন চালাবে এ ভাবে?'

কানু গলায় জোর দিয়ে বললে, 'পারতেই হবে। এতখানি বিষয় আমি হাতছাড়া হ'তে দেব না। নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে আছে তাও হাজার চল্লিশের কম নয়। চারখানা বাড়ী কাশীতে। এ ছাড়া জমি কেনা আছে এখনও কানপুরে অনেক খানি। আমি একদিন লুকিয়ে দলিলপত্র দেখেছি। এ ছাড়া, আবার নতুন ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন। দুখানা সাইকেল রিক্সা লাইসেন্স পেয়েছেন। তাতেও দৈনিক সাড়ে-তিনটাকা আয়।'

'কিন্তু তাই ব'লে এত কষ্ট সহ্য ক'রে—'

'কষ্ট ত খাওয়া পরার নেই। শুধু দুটো মুখের কথা। সে আমি তৈরী হয়েই এসেছি। দেখি কত কথা উনি বলতে পারেন। বাবা জ্যাঠা কাকাদের মুখে গল্প ত কম শুনিনি—জেনে শুনেই এসেছি।'

'উনি যদি উইল না করেন? যদি এমনি মারা যান? তাহ'লে ত সব জ্ঞাতিরাই সমান পাবে। তুমি এত কষ্ট করবে আর ফল ভোগ করবে সবাই?'

কানুর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখলুম বেশ পরিষ্কার। সে বললে, 'চেষ্টা করব উইল করিয়ে নিতে। নইলে সকলে পেলেও, একটা হিস্‌সা ত আমি পাবোই।

তাই বা কে দিচ্ছে বলুন ? লেখাপড়া শিখিনি, এমন যুদ্ধের বাজার গেল তাই কিছু করতে পারলুম না—ত এখন। চাকরী বাকরী পাবোনা এটা ঠিক। ব্যবসারও টাকা নেই। এইটেই মনে করব চাকরী—কী বলেন ? আর একটা কথা কি জানেন, তারাও ত সবাই এই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে গেছে, কিছু কিছু ভাগ পাওয়া উচিত। আমি ত তবু ওঁর এই বয়সে এসেছি, ঝাঁঝ ঢের কম। বিরানব্বই হয়ে গেছে কত দিনই বা বাঁচবেন ? বড় জোর পাঁচ ছ বছর ? আমারই বা কি বয়স এমন—পাঁচ ছ বছর না হয় চাকরের মত খাটলুমই।'

কথাবার্ত্তা শুনে মনে হ'ল বিষয়টা কানুর বরাতেই নাচছে।

এর পর যে কদিন রইলাম, তাতে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল। কানুর ধৈর্য্যর যেন শেষ নেই। যে গালাগালি এবং লাঞ্ছনা সে সহ্য করে তাতে পাথরও বোধ হয় বিচলিত হ'ত। তার মুখও মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে, কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে নিরুদ্ধ রোষে—মনে হয় এই বুঝি ফেটে পড়ল—কিন্তু শেষ অবধি সামলেই নেয়। সেবাও খুব করে। বিনা প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বেরোয় না—দিনরাতই কাছে কাছে থেকে এটা ওটা মুখে মুখে জোগায়। সন্ধ্যার পর গা-হাত-পা টেপা ত আছেই। এ বড় কম শক্তি নয়—ঐকান্তিক সেবার বদলে অকৃতজ্ঞ ব্যবহার পেয়েও অবিচলিত থাকা ! মনে মনে তারিফ করলাম কানুর। হ্যাঁ, সাধনা বটে।

মাস ছয়েক পরে আবারও কাশীতে নেমেছিলাম একদিনের জন্য। কোন কাজ ছিল না, ঐ পথে ফেরার সময় কৌতূহল প্রবল হওয়াতেই নেমে পড়লাম।

দেখি শ্রীমান্ কানু এখনও টিকে আছেন। তবে উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই—ভাল দামী জামা উঠেছে গায়ে, জুতোটাও বেশ মূল্যবান। দিদিমারও উন্নতি হয়েছে—কটুবাক্য বলছেন, তবে তাতে আগের ঝাঁঝ আর নেই। এবং কথায় কথায় অপমানও করেন না। কানু বাজারে বেরিয়ে যেতে চুপি চুপি বললেন, 'ছোঁড়াটা বোধ হয় টিক্‌ল রে। সাত চড়েও রা করে না যে।'

'আপনিও অনেকটা নরম হয়েছেন।'

'না হ'য়ে করি কি বল। বলে পায়ে-পড়ারে ছাড়া ভার। জুতো খেয়েও পরের মুহূর্তে এসে যে পা টিপতে বসে, তাকে কি বলব? আমারও ত একটা বিবেচনা আছে। বিষয় যখন একজনকে দিয়ে যেতেই হবে—যে এত সহ্য করছে তাকেই দিয়ে যাবো, আর কতদিন এমন বাছাই করব।'

এই সুযোগে আমি কথাটা পাড়লুম, বললুম 'তা মন যখন স্থির ক'রেই ফেলেছেন তখন এইবেলা একটা লেখাপড়া—'

'ওরে আমি কি এতই বোকা? আমি অবিশ্যি এখনই মরব না তা জানি। তবু ওকে লুকিয়ে উইল আমি একটা ক'রে ফেলেছি। ওকে জানতে দিইনি, তাহ'লে ছোঁড়া পেয়ে বসবে।'

বুড়ীর মন খুবই নরম হয়েছে দেখলুম। একটু থেমে রীতিমত স্নেহ-কোমল কণ্ঠেই বললেন, 'ছোঁড়ার পাঁচ টাকা ক'রে হাত খরচেরও বরাদ্দ ক'রে দিয়েছি। বড় হয়েছে, বিড়ি সিগারেট খায় নিশ্চয়ই। নইলে চলবে কী ক'রে? আমার এক একদিন ওর ঐ গায়ে-পড়া দেখে কি মনে হয় জানিস নাতি, আমার পাঁচুগোপালই বুঝি আর একজন্ম ঘুরে

আবার আমার কাছে এসেছে। নইলে এত বিষ সহ্য ক'রেও কি প'ড়ে থাকতে পারত ?'

কানুকে মনে মনে অভিনন্দিত করলুম। ছোকরার এলেম আছে—বংশের এতগুলো লোক যা পারেনি তাই ও সম্ভব করলে। বাহবা !

আরও মাস-ছয়েক পরে, কানু বা দিদিমার কথা যখন ভুলেই ব'সে আছি, অকস্মাৎ এক টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে চল্লিশটা টাকা এসে পৌছিল, সেই সঙ্গেই দিদিমা লিখেছেন, 'একবার এসো। খুব জরুরী।' পাকা কাজ বুড়ীর—টাকার কথা ভুল হয়নি। তখনও ট্রেনের সময় ছিল, পাঞ্জাব মেলে রওনা হয়ে গেলুম। পৌছতেই দোরের কাছে দিদিমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেল্‌লেন। বললেন, 'এসেছিস নাতি। ওরে, এ দুর্দ্দিনে তুই ছাড়া আর কারুর কথা মনে পড়ল না। তাই তোকেই টেনে আনতে হ'ল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

'কী কুক্ষণেই যে মনে হয়েছিল যে পাঁচুগোপালই আবার ফিরে এসেছে। বিশ্বনাথ যে ছেলের সেবা আমাকে নিতে দেবেন না, তা ভুলেই গেছি। ছোঁড়ার বিয়ে দেব সব ঠিক ঠাক—আর দুদিন পরেই বিয়ের তারিখ। এমন সময় অসুখে পড়ল।'

'কি অসুখ ?'

'জ্বর। প্রথম অত গ্রাহ্য করিনি। তারপর বাঁকা দাঁড়াল। শুনলুম টাইফয়েড। বড় ডাক্তার ডাকলুম। কাল শুনলুম ওর ওপর প্লুরিসিতে দাঁড়িয়েছে। তাইত ভয় পেয়ে তোকে তার করলুম। আমি আর ছুটোছুটি

করতে পারি না—পা যেন এইবার ভেঙ্গে আসছে। তা ছাড়া মনের জোরও গেছে, হাত-পা পাই না কোন কাজে। কাকে ডাক্‌ব বল, ওর যে জ্ঞাতিরা আছে তারা এসে ওকেই মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে, জানে যে ও ম'লে বিষয় তারা পাবে। এই এক হয়েছে জ্বালা। বাড়ীর লোককেও বিশ্বাস নেই। তুই বাবা যেমন ক'রে হোক্ ওকে বাঁচিয়ে তোল। যেখানে যা ডাক্তার আছে নিয়ে আয়—খরচের জন্যে ভাবিস্‌নি। যাতে ভাল হয় তাই কর।'

কানুকে দেখলাম। খুবই দুর্ব্বল—আমাকে দেখে ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমি কি বাঁচব না দাদা—এত কষ্ট বৃথা হবে?'

উৎসাহ দিলুম, 'ভয় কি? বড় ডাক্তার আনছি।'

যেখানে যত ডাক্তার ছিল প্রায় সবই জড়ো করলুম। বাড়ীর লোকের ওপর দিদিমার সন্দেহ ব'লে নার্স ঠিক করলুম। দিনেরাতে দু'জন পালা ক'রে থাকবে। বুড়ীও ঠায় ব'সে রইল। এককালে এই বাড়ীতে যে কেনা গোলামের মত ছিল, তারই চিকিৎসায় রাজকীয় আয়োজনের কোন ত্রুটি হ'ল না। প্রত্যহ আড়াইশ টাকা ক'রে বেরিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আরও দিন আষ্টেক ভুগে ও ভুগিয়ে কানু একদিন পার্থিব বিষয়ের মায়া কাটাল চিরকালের মত।

•

দিদিমা প্রথমটায় আছড়ে পড়েছিলেন কিন্তু তারপরই সামলে নিলেন। নিজে গেলেন মণিকর্ণিকা পর্য্যন্ত। বললেন, 'পাঁচুর মুখে আগুন দিয়েছি যখন, তখন এটাই বা বাকী থাকে কেন, আমার সব সইবে।'......

পরের দিনই দিদিমা উকিলকে ডেকে পাঠালেন। উইল বদল করতে হবে। আমাকে সাক্ষী রেখে পুরোনো উইল বাতিল ক'রে বিষয় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে দান করলেন। শুধু কিছু কিছু নগদ টাকা তাঁর পুরোনো রাঁধুনি ও ভাড়াটেদের দিয়ে গেলেন। অবশ্য এ সবই তিনি মরবার পর অর্শাবে। উইল ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না—গাড়ী ডাকিয়ে আদালত পর্য্যন্ত গিয়ে রেজেস্ট্রী ক'রে দিলেন।

আমি নিরস্ত করার চেষ্টা করলুম, 'এত তাড়াতাড়ি কি দিদিমা, দুদিন পরেই না হয় হ'ত।'

কেমন একরকম অদ্ভুত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসলেন। মুখে শুধু বললেন, 'না। আজই সারতে হবে।'

সন্ধ্যের সময় আমার ডাক পড়ল। নির্জ্জন ঘরে দোর বন্ধ ক'রে আমার হাতে গুণে দিলেন নগদ দুহাজার টাকা। বললেন, 'শাস্ত্রমতে যা করবার সবই কানুর জন্যে করতে হবে। কোন ত্রুটি না হয়। বাহুল্যের দরকার নেই—তবে কাঙ্গালী খাইও কিছু।'

ব্যাকুল হয়ে বলতে গেলুম, 'আর আমাকে কেন দিদিমা—'

এ কী বিপদে আমাকে জড়াচ্ছে বুড়ী! ভাড়াটে সম্পর্কে মা ওঁকে 'মা' বলেছিলেন সেই সুবাদে দিদিমা বলি। আমি এর মধ্যে কী করব?

'তুমি ছাড়া, আর কে করবে ভাই? যাকে দেব সেই ত চুরি করবে। এইটি উদ্ধার ক'রে দিয়ে যাও। যদি বেঁচে থাকি ত পিণ্ডিটা আমিই দেব, নইলে যাকে দিয়ে হোক সেরো। তবে কানুর জন্যে হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ করবে—বাকি হাজার রইল আমার শ্রাদ্ধের জন্যে। জ্ঞাতিদের কাউকে খবর দিতে হবে না। এটা তুমিই ক'রো। আর একটা কথা, উইলের তুমি

আছি, তাই আর সেখানে কিছু দিতে পারিনি—এই গয়নার বাক্সটা তুমি নিয়ে যাও। কানুর বৌয়ের জন্যে গড়িয়েছিলুম। প্রায় চার হাজার টাকার গয়না —এ যেন তোমার বৌয়ের ভোগে লাগে।—'

'আ! এসব কথা এখন থাক না।'

'উহুঁ।' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন দিদিমা, 'থাকলে চলবে না। এতকাল পাঁচু গেছে, একদিন ছাড়া তাকে স্বপ্ন দেখিনি। আজ ভোরে তাকে দেখেছি। বুঝেছি এতদিনে মনে পড়েছে মাকে। হয়ত ডাক এসেছে এইবার। তৈরী থাকি। গয়না যে তোমাকে দিলুম তা লেখা আছে ঐ বাক্সের মধ্যেই।······এইবার তুমি শুতে যাও।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গল রাঁধুনির কান্নায়।

এত বেলা হয়েছে উঠছেন না দেখে সে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গেছে। শরীর কাঠ আর ঠাণ্ডা। ঘুমের মধ্যেই বুড়ী কখন মারা গেছে—কেউ টের পায়নি।

দুর্জ্ঞেয়

মানিকবাবু দারুণ বিরক্ত হয়েছেন। আর বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে বৈ কি! ভদ্রলোকের পাড়ায় এ কী কাণ্ড! রোজ সন্ধ্যা হ'লেই লোকটা মদ খেয়ে এসে হল্লা শুরু করবে—এবং করবে বলতে গেলে ওঁরই কানের কাছে। ওঁর ভেতরের বারান্দার সামনা-সামনি মনীশদের উঠোন, আর তার ঠিক ওপারেই শৈবালদের বাড়ীর বারান্দা। সেইখানে দাঁড়িয়েই যত গোলমাল এবং চীৎকার লোকটার।

আগে হ'লে মানিকবাবুর বিরক্তিই যথেষ্ট ছিল। ওঁর ভুরু কোঁচকাতে দেখলেই পাড়ার লোক তটস্থ হয়ে উঠত। সেকালে এ পাড়ার মধ্যে উনিই একমাত্র বড় সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন—তাও যেমন তেমন বড় নয়—তখনকার দিনে সতের শ' টাকা মাইনের গরিষ্ঠ কেরানী, মানুষের শুধু সম্ভ্রম নয়—ত্রাসের সঞ্চার করত। কিন্তু সে দিন আর নেই। প্রথমত মানিকবাবু পেন্‌সন্ নিয়েছেন, লোকের চাকরী খাবার বা ক'রে দেবার হাত তাঁর চ'লে গেছে, দ্বিতীয়ত এখন তিনি ধরেছেন কন্‌ট্রাক্টরি ব্যবসা—তাতে মেজাজ সর্ব্বদা চড়িয়ে রাখার অভ্যাসটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন ক'রে মন জোগানোর পাঠ নিতে গিয়েও যে খুব সফল হয়েছেন তা নয়, মাঝখান থেকে আগেকার রাশভারী গাম্ভীর্য্যটা হারিয়ে ফেলেছেন। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা—আগেকার দিনের অর্থাৎ তাঁর চাকরীর আমলে এ পাড়ার যাঁরা বাসিন্দা আজ তাঁরা সংখ্যালঘু। বিস্তর নতুন লোক এসেছে এ পাড়ায়।

নানা দেশের নানান্ মানুষ। উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত। প্রথম বয়স থেকে যে ধরনের বিনম্র বাধ্যতায় তিনি অভ্যস্ত, এদের ভেতর সেটার চিহ্ন খুঁজে পান না তিনি। ভয় হয় এদের কাছে মেজাজ দেখাতে। সম্মান যদি না থাকে? একবার গেলে ও বস্তুটি ফিরে পাওয়া শক্ত—এটুকু ব্যবহারিক জ্ঞান মানিক-বাবুর আছে। এখনও তবু বড় বাড়ী, দামী গাড়ী ও যত্নকৃত দূরত্বের একটা মোহ লোকের কাছে আছে। ওরই মধ্যে সামান্য একটু সম্ভ্রম, সামান্য একটু সমীহের ভাব ওদের চোখে তবু ফোটে—চোখে চোখ পড়লে। সেটুকু সহজে খোয়াতে রাজি নন তিনি।

অথচ এ অবস্থাও ত অসহ্য!

প্রতিদিনই রাত দশটা এগারোটা থেকে ঐ হল্লা, কটূক্তি ও চীৎকার শুরু হয়। চলে রাত একটা দেড়টা পর্য্যন্ত—যতক্ষণ না নেশা ও শ্রান্তিতে মাতালটার চোখ বুজে আসে। কতক্ষণ সহ্য করা যায়? এক একদিন মনে হয় তাঁর হাণ্টারটা নিয়ে গিয়ে খুব দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে আসেন কিংবা তাঁর গোণ্ডা জেলার দারোয়ান সূর্য্যপালকে দিয়ে ধ'রে আনিয়ে ওরই নাল-বাঁধানো জুতোর ঘায়ে লোকটার মুখখানা থেঁৎলে বিকৃত ক'রে দেন।...দেওয়াও চলত হয়ত—যদি পাড়ার কারুর কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছুমাত্র, উৎসাহ না হোক, সমর্থন পেতেন।

শৈবালের বাবার একেবারেই মাথা খারাপ। তিনি আর ভাড়াটে পান নি—ঐ লোকটিকে ঘর ভাড়া দিয়ে ব'সে আছেন। তাই লোকটাকে এখন তাড়িয়ে দে! তারও ত কোন চেষ্টা দেখা যায় না—বেশ শান্তভাবেই সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। ছেলেপুলের ঘর, এই অনাচার যে কী ক'রে সহ্য করেন, আশ্চর্য্য! ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে এই অসৎ উদাহরণ।

শৈবালের বাবা উপেনবাবু, এ পাড়ায় ঠিক নবাগত না হ'লেও খুব পুরাতনও নন। অর্থাৎ মানিকবাবুর গৌরবময় যুগের লোক নন। ডেকে ধমকে দেওয়ার মত সম্পর্ক তাঁদের নয়। তাছাড়া উপেনবাবু মানুষটাও যেন কেমন কেমন। মার্টিন কোম্পানীর সামান্য কেরাণী থেকে বড় অফিসার হয়েছেন—সেই মত মেজাজটা তাঁরও কড়া।

সুতরাং কোথাও কোন উপায় খুঁজে পান না ভদ্রলোক, শুধু নিষ্ফল রোষে প্রত্যহ গর্জ্জে বেড়ান। ঘরের মধ্যে পায়চারী করেন আর অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করেন নানা রকম।

সব চেয়ে তাঁর বিপদ হয়েছে—কারও কোন সহানুভূতি নেই।

তাঁর স্ত্রী, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী ও তরুণী স্ত্রী সুরমা—যার জন্য বেশি মাথা-ব্যথা মানিকবাবুর এই ব্যাপারে, যার রুচিবোধ ও আভিজাত্যের জন্যে তাঁর সংকোচের সীমা নেই—তিনিই সেদিন ব'লে ফেললেন, 'তার বাড়ীতে সে চেঁচাচ্ছে তাতে তোমার এত জ্বালা কেন? সে-বাড়ীর লোক কিছু বলে না, তার পাশের বাড়ীর লোক কিছু বলে না—যত অসুবিধে কি তোমারই? ইচ্ছে হয় ওদিককার সব জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দাও। তার জন্যে এত গজ্‌রাবার কি আছে?'

নাও কাণ্ড!

মানিকবাবু ত ভেবেই পান না যে তাঁর মাথা খারাপ হ'ল, না কান? অর্থাৎ তিনি ঠিক শুনছেন ও ঠিক বুঝছেন ত?

তবু এই প্রথম বোধ হয় মাতালটার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাও বোধ করেন।

সুরমা তাঁর সঙ্গে এতগুলো কথা বলবে এ যেন ধারণারও অতীত। আশা ও কল্পনা ত বহুকালই ছেড়ে দিয়েছেন মানিকবাবু।

দরিদ্রের ঘর থেকেই এনেছিলেন তিনি, অত্যন্ত চড়াদামে কিনতে হয়েছিল এ স্ত্রীরত্ন। খুবই দরিদ্রের ঘর ওদের। তবু মূল্য কম নেননি সুরমার বাবা। বাইশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ীর মর্টগেজ ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে সে-বাড়ী সারিয়ে দিতে হয়েছিল। রতনবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমার কি বলুন, আপনার মত রাজা জামাই আসবে ভাঙ্গা বাড়ীতে—সে যে আপনার অপমান।'

আসল কথা বাড়ী উদ্ধার ক'রে সারিয়ে নিচের তলাটা মোটা টাকায় ভাড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন রতনবাবু। ইহকালের ভাবনাটা আর রইল না। মেয়েকেও তিনি তাই কথা দিয়েছিলেন। সুরমা যেদিন শুনেছিল পঞ্চান্ন বছরের বিপত্নীক মানিকবাবু ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে এসে তাকে নিজেই বিয়ে করতে চেয়েছেন এবং তার জন্য যে-কোন দাম দিতে রাজী আছেন, আর সেই সঙ্গেই শুনেছিল যে এক মাসের মধ্যে বাইশ হাজার টাকা না দিতে পারলে এ বাড়ী নিলাম হয়ে যাবে এবং সে নীলামে যা দাম উঠবে তা বাইশ হাজারের বেশি হবে না কিছুতেই—অর্থাৎ কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পথে বসতে হবে, সেদিন এ দুটো সংবাদের মধ্যেকার যোগাযোগ-রক্ষাকারী অনুক্ত বক্তব্যটা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি তার। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে স্থির হয়ে বসেছিল সে, একদৃষ্টে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে—সে সময় মধ্যে মধ্যে রক্তের ঢেউ সে পাংশুকপোলের উপর দিয়ে খেলে গিয়েছিল কি না প্রবীণ রতনবাবু তা লক্ষ্য করেন নি—তারপর শান্ত কণ্ঠেই বলেছিল সে, 'মেয়ে যদি বেচতে হয় বাবা, ত বেশ চড়া দামেই বেচো। বাকী জীবনটা যেন আর

দুঃখের পেছনে দৌড়তে না হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ ক-টা দিন কাটিয়ে দিতে পারো এমন ব্যবস্থাই ক'রে নিও।'

সুরমা জানত যে বাবা টাকা উড়িয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হন নি। তিনটি বোনের বিয়ে দিয়েছেন ঋণ ক'রে—তারই ফলে এই অবস্থা। সে তাঁকে ক্ষমা করেছিল।

এ-ই সুরমার বিবাহের ইতিহাস। বাড়ীতে পা দিয়ে তার সেই তেইশ বছরের সপত্নীপুত্রকে দেখতে পায় নি। ঘৃণায় নাকি বাড়ী ত্যাগ ক'রে সে মামার বাড়ী গিয়ে উঠেছিল, সেইখান থেকেই বিলেত চ'লে গেছে। তা যাক্! দুঃখ? দুঃখ কারুর কোন আচরণে পেয়েছে কি না সুরমা তা আজও মানিকবাবু বুঝতে পারেন নি।

দরিদ্রের ঘর থেকে অত পয়সা দিয়ে কিনে আনার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন কি না মানিকবাবু তা আমরা জানি না—হয়ত রূপ ও যৌবনের এবং হঠাৎ বড়মানুষের ঘরে পড়ার জন্য কিছু অহঙ্কার আশা করেছিলেন কিন্তু এমন চরম ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা তিনি কখনই কল্পনা করেন নি।

হয়ত ঔদাসীন্য বললে ভুল বলা হবে। এক রকমের অবজ্ঞা-মিশ্রিত উপেক্ষা বলাই ঠিক। জিনিসের মূল্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা দেখলে মানিকবাবুই অবাক হয়ে যান। দাম না জানা থাকলেও সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বেছে নিতে কখনও ভুল হয় না। দামী কাপড়-জামা-আসবাবই সে ব্যবহার করে কিন্তু কোনটা সম্বন্ধে এতটুকু আসক্তি নেই। অর্থ সম্বন্ধে এমন নির্ব্বিকার ভাব মানিকবাবু দেখেননি বললে একটু অবিচার হবে—ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে বহু কোটিপতির সঙ্গে মিশেছেন, একমাত্র

তাদেরই ঘরে কারুর মধ্যে এই উপেক্ষা ও নিস্পৃহতা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ভেবেই পান না যে এ আভিজাত্য সুরমা কোথায় পেলে।

এর জন্য তিনি গর্ব্বিত বোধ করতে পারতেন যদি পরিপূর্ণ অধিকার তাঁর জন্মাত ঐ মেয়েটির ওপর। একদিন মানিকবাবু বহু দুঃখেই আবিষ্কার করলেন যে তিনি তাঁর এই সুন্দরী ও অভিজাত স্ত্রীটিকে রীতিমত সমীহ ও ভয় ক'রেই চলেন। অথচ কোন বিরুদ্ধভাব তার নেই—বিদ্রোহ ত নয়ই। কথা কইলে যে উত্তর দেয় না তা নয়, কিন্তু উত্তরই দেয় শুধু। নিজে থেকে কখনই কথা কয় না। পাশে ব'সে থাকলে উঠে যায় না—ওঁর সঙ্গ এড়াবার চেষ্টা নেই—কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের মতই ব'সে থাকে পাশে, তাতে প্রাণের স্পর্শ পান্ না। সঙ্গ আছে কিন্তু সঙ্গ-সুখ নেই। অথচ রাগ করবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পান্ না—ভদ্রভাবে রাগ ক'রেও দেখেছেন—কোন ফল হয় না। যে মান ভাঙ্গাবে একমাত্র তার ওপরই অভিমান করা যায়—কী দাবীতে কিসের জোরে অভিমান করবেন? ক্রোধ প্রকাশের হেতুও হয় না বিশেষ, সুরমা যে তাঁর বাধ্য নয়, এমন কথা কিছুতেই মানিকবাবু বলতে পারেন না।

তার ওপর বছর দুই হ'ল ওর আর একটি অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে মানিকবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বাতজ্বরে কয়েকদিন বেশ একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন—হাতের এমন জোর ছিল না যে কলম ধরেন। তাই সুরমাকে বলেছিলেন ওঁর সুপারভাইজিং এঞ্জিনীয়ারকে একটা চিঠি লিখে দিতে। উনি বক্তব্যটা বাংলাতেই বলেছিলেন, আশা করেছিলেন যে কোনমতে চলনসই ভাষায় সুরমা বাংলাতে লিখে দিতে পারবে—কিন্তু চিঠি লেখার পর যখন উনি দেখতে চাইলেন তখন সুরমা ওঁর হাতে কাগজটা দিতে ওঁরা দুজনেই চম্‌কে

উঠলেন। চমৎকার শুদ্ধ ইংরেজীতে অফিসিয়াল নির্দ্দেশ! পাকা কেরাণীও সে ভাষায় লিখে গর্ব্ববোধ করত! মানিকবাবু চম্‌কে উঠলেন ওর ইংরেজীতে এই অসামান্য দখল দেখে, আর সুরমা চম্‌কে উঠল অজ্ঞাতসারে নিজের এই বিদ্যাটা প্রকাশ পেয়ে গেছে ব'লে। আফিসের চিঠি ব'লে স্বাভাবিকভাবে, সহজেই ইংরেজীতে বেরিয়ে গেছে কলম দিয়ে—এখন স্বামীর চোখে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় দেখে নিজেই সচেতন হয়ে উঠ্‌ল।

মানিকবাবু বললেন, 'তবে যে তোমার বাবা বলেছিলেন তুমি কখনও ইস্কুলে পড়োনি!'

'ঠিকই বলেছেন। বাবা মিথ্যা কথা বলেন না।'

'তবে এমন ইংরেজী শিখলে কোথায়?'

'বাড়ীতেই পড়েছি।'

'কে পড়িয়েছেন, বাবা?'

'না।'

এর চেয়ে বেশি প্রশ্ন করতে মানিকবাবুর সাহসে কুলোয়নি।

ফলে স্ত্রীর সম্বন্ধে সম্ভ্রমবোধ বেড়েই গেছে। আরও বেশি সমীহ করেন, আরও বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তার সম্বন্ধে কিছু করতে গেলে—কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু বিলাসের উপকরণ জোগাতে গেলে মনে হয় কোনটাই বুঝি উপযুক্ত হচ্ছে না এমন স্ত্রীর। গর্ব্ব বোধ করেন যথেষ্টই—বাইরে কর্ম্মচারীদের কাছে ব'লে বেড়ান যে তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসার কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর স্ত্রী এমন সাতটা অফিস চালাতে পারবে।

কিন্তু এত সব অনুভূতি সত্ত্বেও আসলটি নেই। তৃপ্তি বোধ করতে পারেন না। হাতের মুঠার মধ্যে থেকেও যে সুদূর, তাকে দিয়ে বুক

ভরলেও মন ভরে না—গর্ব্বে বুক ফুলে উঠ্‌তে পারে কিন্তু তৃপ্তি কোথায় ?

এ হেন স্ত্রীর আভিজাত্য নিয়েই যখন এত দুর্ভাবনা, তার রুচিবোধের ক্ষুণ্ণতার আশঙ্কাই ওঁর বিরক্তির প্রধান কারণ—তখন অকস্মাৎ সেই স্ত্রীর এ কী উক্তি ?

ঈষৎ ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই মানিকবাবু উত্তর দিলেন, 'আমি ত এসবে অভ্যস্ত, কুলীকামারী নিয়ে আমার কারবার। তোমার জন্যেই আরও—'

'আমি !' একটুখানি হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। সে হাসিতে কী ছিল ? বিদ্রূপ ? হতাশা ? অভিযোগ ? কে জানে ! মোনালিসার হাসির মতই বিচিত্র, রহস্যময়।

অতশত বোঝেন না মানিকবাবু। কেমন যেন ম্লান হয়ে কুঁকড়ে যান শুধু এই হাসির সাম্‌নে। কী বক্তব্য, অভিযোগই কিছু আছে কিনা—প্রশ্ন করতেও সাহসে কুলোয় না।

কিন্তু তাই ব'লে অত সহজে ছাড়বার লোক মানিকবাবু নন্। তিনি গোপনে গোপনে পাড়ায় লোক লাগালেন, উপেনবাবুর কাছ থেকে খবরটা সংগ্রহ করবার জন্য। খবরটা শুনে আরও একবার নিষ্ফল রোষে দাঁত কিড়মিড় করেন। লোকটার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ, নইলে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে! ঐ মাতালটা নাকি ডবল এম-এ পাস। ইংরেজী আর ইকনমিক্‌স্ দুটোতেই ফার্স্ট হয়েছিল। ওর মত ইংরেজী লিখতে নাকি ইংরেজরাও পারে না। কোন কলেজের প্রফেসারীও পেয়েছিল কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানের জন্যই সে চাকরী যায়। তারপর ইস্কুলের মাস্টারী—তা থেকে এখন

শুধু কয়েকটি টিউশ্যনী ভরসা। সকালের দিকে টিউশ্যনী করে, বিকেলের দিকে মদ খায়, এই ওর কাজ। উপেনবাবু শৈবালদের সবকটা ভাইবোনকে পড়াবার বিনিময়ে ওকে থাকবার জন্য সিঁড়ির চিলেকোঠার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। আর দুটি দুটি খেতে দেন। বিকেলে খাবার মত অবস্থা কোন দিনই থাকে না, দিনের বেলাও অর্দ্ধেক দিন খায় না—পেটের ব্যথায় পেট টিপে ব'সে ব'সে পড়ায়। অর্থাৎ একরকম বিনা খরচে এমন একটা পণ্ডিত মাস্টার পাওয়ার লোভেই নাকি এত ঝামেলা সহ্য করেন ভদ্রলোক '

'এমন না হ'লে বুদ্ধি!' মানিকবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসেন, 'ছেলেকে পড়াতে গিয়ে ওধারে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল! ঐ ব্যাড এক্‌জাম্পল্ চোখের সামনে রাখলে ছেলেপুলে মানুষ হবে? তা ওঁর ছেলেপুলেকে উনি যা খুশী করুন—কিন্তু পাড়ার ছেলেদের অধঃপাতে দেবার কী অধিকার আছে ওঁর?'

যে লোকটি খবর সংগ্রহ ক'রে এনেছিল সে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে আবারও বললে, 'শুধু কি তাই! রোজগার নেই বলতে গেলে একপয়সাও, অথচ মদ খাওয়া চাই রোজ—রীতিমত ভিক্ষে করে মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আবার সেদিন দেখি পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে দু' পয়সা এক পয়সা ক'রে চাইছে।'

'রাস্কেল! ব্ল্যাক গার্ড। এ সব লোকদের যারা প্রশ্রয় দেয় তাদেরও হর্স-হুইপ করতে হয়।' দাঁতে দাঁত চেপে বলেন মানিকবাবু।

বেশিদিন আর উদাসীন থাকা যায়ও না। লোকটা বড্ডই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। অকথ্য কথা বলে সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। বিশেষ ক'রে একদিন যখন দেখলেন যে সুরমা খাওয়ার পর রাত্রে

আগে নিয়মিত ছাদে বেড়াত এখন সেটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, তখন আরও আক্রোশ বেড়ে গেল। অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে ওর মার্জ্জিত রুচিতে বাধে ব'লেই সুরমা বোধ করি ওঁকে সেদিন ঐ কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু এধারেও নিশ্চয়ই অসহ্য হয় ওর। নইলে এত দিনের অভ্যাস ছাড়বেই বা কেন? না না, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে, মনে মনে বিষম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মানিকবাবু—এমন করলে সুরমার স্বাস্থ্য টিকবে কেন? এই কদিনেই যেন বেশ একটু কৃশ হয়ে গেছে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন মানিকবাবু, ওর চোখের কোণেও যেন কালি পড়েছে, বেশ সুস্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ।...

সব লাজ-লজ্জা সম্ভ্রমবোধ বিসর্জ্জন দিয়ে মানিকবাবু একদিন শৈবালদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। উপেনবাবু ত অবাক—চোখকেই যেন বিশ্বাস হয় না। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে বলেন, 'কী ভাগ্য আমার! আসুন আসুন!'

'ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য বরং বলতে পারেন। আপনার আমার—পাড়ার সবাইকারই। এ কী মাল জুটিয়েছেন, বাড়ীতে যে টিকতে পারি না!'

গম্ভীর হয়ে ওঠে উপেনবাবুর মুখ। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'ব্যাপারটা যে আমিও খুব প্রসন্ন মনে সহ্য করছি তা ভাববেন না। আসল কথা কি জানেন, আগে অতটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এখন ফেলিই বা কোথায়, চ'লে যাবার কথা ত কানেই তোলে না। তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় প'ড়ে মরবে। তবু সেদিন বলেছিলুম, বেশ রূঢ় ভাবেই বলেছিলুম—বলে, মরণ রোগ ধরেছে, বেশিদিন বাঁচব না—আপনার

আশ্রয়েই মরতে দিন। একটুখানি আত্মীয়তাও আছে খুব দূর সম্পর্কের —একেবারে রাস্তায় বার ক'রে দিতেও পারছি না।'

'ওর আর কে আছে?' মানিকবাবু প্রশ্ন করেন।

'কেউ নেই। সেই ত হয়েছে বিপদ। মা-বাবা ত ছিলই না কখনও— পরের ঘরে মানুষ, বলতে গেলে পাড়ার লোকের দয়ায়। কিন্তু লেখাপড়ায় চিরদিনই ব্রিলিয়ান্ট—নিজে প'ড়ে টিউশ্যনী ক'রে পাড়ার গরীব ছেলে-মেয়েদেরও অনেককে পড়িয়েছে ও। অনাথ ছেলে ব'লে উন্নতির চেষ্টা ওর খুবই ছিল—উন্নতি ক'রেও ছিল খুব। একটা এম-এ পাশ ক'রে মাস্টারী পায়, মাস্টারী করতে করতেই আর একবার এম-এ পাশ করলে। ভাল চাকরী পেত, পড়ানোর দিকে ঝোঁক ছিল ব'লে প্রফেসরী নিলে, অবশ্য সরকারী কলেজেই ঢুকেছিল, ক্রমে মোটা মাইনে হ'ত—কিন্তু কী ক'রে যে কী হ'ল! দেখুন না এই এক ঘোড়ারোগে সব গেল!'

'এটা হ'ল কি ক'রে?' প্রশ্ন করেন মানিকবাবু।

'সেটা ঠিক জানি না। লোকপরম্পরায় শুনেছি কিসে একটা দারুণ শক্ পেয়েই নাকি এই দিকে ঝোঁকে। আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলুম ওর 'সোবার' অবস্থায়। চুপ ক'রে থেকে হেসে জবাব দিয়েছিল, জীবনে বড় ঝামেলা—তাই দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভগবান দু'হাতে ব্যয় করার মত অর্থ ত দেন নি, জীবনটাই তাই বিলিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছি এমনি ক'রে।'

'আশ্চর্য্য ত!'

মানিকবাবুও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর বললেন, 'তাই ত, কিছুই করা যাবে না?'

উপেনবাবু বললেন, 'করতেও বোধ হয় হবে না। কাল ত লিভারের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে ছিল ছ' ঘণ্টা। তার ওপর গিয়ে মদ খেয়েছে। মদ খেলে নাকি গলা থেকে পেট পর্য্যন্ত জ্বলতে থাকে—তবুও খায়। ক-দিন বা বাঁচবে ?'

'আচ্ছা, চলি' ব'লে মানিকবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

'বিলক্ষণ,' সসব্যস্তে উপেনবাবু বলেন, 'গরীবের ঘরে এলেন, একটু চা-টা ?'

'না না—কিছু না। ধন্যবাদ। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, আমার স্ত্রীর বড় ডেলিকেট নার্ভ্‌স্—রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন উনি এই ব্যাপারে।'

'তাই ত! বড়ই লজ্জার কথা।···দেখি একবার বুঝিয়ে ব'লে। ছোঁড়া একরকম যেন ডেলিবারেট্‌লি আত্মহত্যাই করতে চায়।'

আশ্চর্য্য এই যে সেই দিন থেকেই সমস্ত গোলমাল কোলাহল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এটা এতই শান্তি, এত আশ্চর্য্য রকমের মুক্তি যে সকলেই ঘটনাটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে। এমন কি সুরমাও তার সুকঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে একদিন স্বামীকে প্রশ্ন করলে, 'তোমার মাতাল কি তোমার শাসনে সত্যিই পাড়া ছাড়লে নাকি ?'

নিজে থেকে কথা বলা সুরমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ব্যবহার। কৃতার্থ মানিকবাবু এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অনুভব ক'রে মুচকী হেসে বললেন, 'আমার নয়—তোমার শাসনে।'

'তার মানে ?' কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ শোনায় সুরমার।

'মানে—আমি সেদিন বলেছিলুম উপেনবাবুকে—যে—মানে তোমার শরীর খারাপ, এই সব চেঁচামেচিতে তোমার নার্ভ অকারণ উত্তেজিত হয়। শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ে।'

'কেন এমন কথা বলতে গেলে তুমি? কী জন্যে বললে? কে বলেছে আমার শরীর খারাপ হয়? আমি বলেছি তোমাকে?'

'না না—তা বলোনি। কিন্তু তাতে ত ফল ভালই হয়েছে গো। কাল উপেনবাবুর মুখে খবর নিয়ে জানলুম যে এতদিন এত লোকের চেষ্টায় যা হয় নি—তোমার নাম ক'রে উনি সেই ঐন্দ্রজালিক ফলই পেয়েছেন। উপেনবাবু বলেছিলেন, তোমার হল্লা হাঙ্গামায় মানিকবাবুর স্ত্রীর শরীর বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি ওঁকে মেরে ফেলবে?···তাইতেই নাকি আশ্চর্য্য ফল হয়েছে। একেবারে সেই দিন থেকে মদ খাওয়া ছেড়েছে। আছে এখানেই—কিন্তু মদ আর খায় না।···তবে শরীর খুব খারাপ নাকি, বেশি দিন আর বাঁচবে না।'

স্থরমা স্বামীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'ভবিষ্যতে আমার নাম ক'রে কাউকে কিছু না বললেই খুসী হবো।'

এই ব'লে সে স্বামীর দিকে না চেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

মানিকবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে ব'সে থেকে বললেন, 'বোঝো কাণ্ড! যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর!'···

সেদিনের পর থেকে আবারও সেই স্থকঠিন স্তব্ধতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল স্থরমা। ও প্রসঙ্গ আর তোলেনি, কোন কথাই কয়নি বলতে গেলে মানিকবাবুর সঙ্গে।

চার পাঁচ দিন পরে হঠাৎ মানিকবাবুই কথাটা পাড়লেন।

'ওগো শুনেছ সেই মাতালটার কাণ্ড ?'

পাষাণ কঠিন মুখভাবে কোন পরিবর্ত্তনই হয় না। শুধু বঙ্কিম ভ্রূ ঈষৎ তুলে প্রশ্ন করে সুষমা. 'কি কাণ্ড ?'

'এত মদ খেত, এখন হঠাৎ সব ছেড়ে দেওয়ার ফলে নাকি একেবারে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখন ডাক্তারে বলছে সামান্য একটু ওষুধের মত খেতে—তাতেও সে রাজী নয়। বলে ছেড়েছি যখন তখন আর না। মরতে ত হবেই, যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল।...বোঝ দেখি। হা-হা !...একেই বলে মাতালস্য ভঙ্গী নানা।'...

সুরমা কথা কইলে না। যে ইংরেজী উপন্যাসখানা (ওর ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় পাবার পর মানিকবাবু অজস্র বিলিতী বই কিনে দিয়েছেন) পড়ছিল, খানিক পরে আবার স্বভাবসুলভ চরম নির্লিপ্ততার সঙ্গে সেইটেই তুলে পড়তে লাগল। কথাগুলো ভাল ক'রে শুনলে কিনা তাও বুঝতে পারলেন না মানিকবাবু।

চার পাঁচ দিন পরে হঠাৎ একদিন পাড়ার ঐ কোণে মৃদু হরিধ্বনি উঠল। সামান্য একবার মাত্র, 'বল হরি হরি বোল !' কিন্তু তবু তা সুরমার কানে পৌঁছল। ছাদে পায়চারী করছিল অভ্যাসমত, শব্দ কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

উপেনবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলিটা ঘুরে গিয়ে যেখানে সদর রাস্তায় পড়েছে সেই বাঁকটা দেখা যায় ওদের ছাদ থেকে। সুরমা একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলে, মাত্র চার পাঁচটি পাড়ার ছেলে একটা মড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল। দীন হীন আয়োজন—নিতান্তই কোন আত্মীয়হীন হতভাগ্যের মৃতদেহ।

শব্দটা মানিকবাবুর কানেও গিয়েছিল।

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'বল-হরি দিলে না? কাদের বাড়ীতে ম'ল? মাতালটা গেল নাকি?'

সুরমা ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিল না, যেমন নিঃশব্দে পায়চারী করছিল তেমনই করতে লাগল। সেদিন বরং একটু বেশিক্ষণই ছাদে রইল—গভীর রাত্রে সে যখন শুতে গেল মানিকবাবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পরের দিন আফিস থেকে এসে শুনলেন, স্ত্রীর শরীর খারাপ, একটু দুধ ছাড়া কিছুই খায়নি সারা দিন।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগেই শোবার ঘরে গেলেন, 'কী হয়েছে তোমার? ডাক্তার ডাকোনি কেন? আমাকে একবার ফোনে জানালে ত পারতে!'

সুরমা ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলে, 'অকারণে ফোন ক'রে লাভ কী? এমনি একটু গা-টা ভার ভার—একটু শুকিয়ে থাকলেই সেরে যাবে।'

কিন্তু তাতেও উদ্বেগ কমে না মানিকবাবুর। তিনি বলেন, 'তুমি বুঝছ না, দিনকাল ভারি খারাপ। বড্ড ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে। ডাক্তার ডাকা ভাল—।'

'প্লীজ!' বাধা দিয়ে সুরমা বলে, 'আমাকে শুধু একটু কোয়ায়েট্‌লি থাকতে দাও!'

ইচ্ছাই যেখানে আদেশ সেখানে মানিকবাবু আর কি করবেন? ম্লান মুখে বেরিয়ে চ'লে এলেন তিনি।

কিন্তু পরের দিনও যখন সুরমা বিছানা ছেড়ে উঠল না—শুধু একটু দুধ আর কমলালেবু খেয়ে রইল, তখন আর মানিকবাবু ওর ভয়েও চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। ডাক্তার নিয়ে বাড়ী ফিরলেন একেবারে। ডাক্তার

গম্ভীর মুখে পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই—এমনি একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ আর কি! একটা মিক্স্চার দিচ্ছি, আর একটা ঘুমের ওষুধ—'

তৎসত্ত্বেও সারা রাত বেশ একটু উদ্বেগেই কাটালেন মানিকবাবু। তাই ভোরের দিকে এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, কখন যে পাশের খাট থেকে সুরমা উঠে গেছে তা টের পাননি। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বিছানা খালি দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে এসে সামনেই কালীর মাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নতুন মা কোথায় গেল কালীর মা?'

'ওমা, তিনি যে গঙ্গা নাইতে গেছে!'

'কোথায় গেছে?'

'গঙ্গা নাইতে গেছে। অন্নপুন্নো গেছে সঙ্গে আর দারোয়ান।'

বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে কালীর মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মানিকবাবু। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলেন, 'বোঝো কাণ্ড!'

সুরমা ফিরে এল আটটারও পর।

'ইকি কাণ্ড তোমার।···দু'দিন জ্বর গেল আর আজই গঙ্গা নাইতে গেলে!' তাড়াতাড়ি নেমে এসে প্রশ্ন করেন মানিকবাবু।

'জ্বর কে বললে? ডাক্তার বলেছে তোমাকে?'

'না, তা অবশ্য বলেনি। কিন্তু গঙ্গাতেই বা কেন?'

'ইচ্ছে হ'ল। দুদিন চান করিনি, মাথা যেন জ্বলছিল!' সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সুরমা শান্ত ধীর ভাবেই।

'মাথায় তেল দাওনি?' খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মানিকবাবু পুনশ্চ প্রশ্ন করেন।

'দিইনি বুঝি ? তা হবে। মনে ছিল না।'

কোনদিকে না তাকিয়েই সুরমা জবাব দেয়।

অন্নপুন্নো ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, 'তেল না সাবান না কিছু না। একে-বারে পাগলির মত সবসুদ্ধ গিয়ে ডুব। তাই কি উঠ্‌তে চায় জল থেকে ? কতক্ষণ ধ'রে যে এক গলা জলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল—তার ঠিক নেই। আমার ত ভয় হয়ে গিছ্‌ল। বলি ভির্মি গেল না ত ? দুদিন খাওয়া নেই !……'

সে ব'কেই যেতে লাগল। মানিকবাবু আর দাঁড়ালেন না, 'দ্যাখো দিকি কাণ্ড, নিমোনিয়া না বাধায় !' বলতে বলতে উদ্বিগ্ন মুখে স্ত্রীর পিছনে পিছনে ছুটলেন।

কর্ত্তব্য

কোন-মতে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে যায় অতসী। মা নিচের ভাড়াটেদের সঙ্গে ব'সে সবিস্তারে আসন্ন বিবাহের ফর্দ্দ আলোচনা করছেন এবং বোধ হয় কালকের কেনা কাপড় জামা টয়লেটগুলো দেখাচ্ছেন—তাই রক্ষা। এই অবস্থায় এখন মার সামনে পড়লে আর রক্ষা ছিল না। পর পর যে প্রশ্নগুলো আসত তা অতসীর জানাই আছে—'হ্যাঁরে এমন অসময়ে যে? অসুখ বিসুখ করেনি ত? শরীর ভাল ছিল? মুখখানা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কৈ, কাছে আয় ত দেখি!' ইত্যাদি—

অথচ এখন তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব জবাব-দিহি করার কথা ভাবতেও পারে না অতসী। সে সেই অবস্থাতেই যেন টল্‌তে টল্‌তে নিজের কোণের ঘরটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ও যে কখনও বাইরের কাপড়ে বিছানায় বসে না—ভাল ক'রে হাত-পা না ধুয়ে ঘরে ঢোকে না, সে কথা ভুলেই গেল। পথে ঘাটে সাধারণ যানবাহন থেকে অসংখ্য রোগের বীজাণু কাপড়-জামায় চ'লে আসে এই ওর বিশ্বাস—ছারপোকা ত বটেই!

কিন্তু আজ আর পারছেনা সে, ক্লান্ত—অপরিসীম ক্লান্ত। এ ক্লান্তির যেন সীমা সেই—অবধি নেই। বিছানাটা যদি বিছানা না হয়ে মৃত্যুর অতল গহন হ'ত তাহ'লেই যেন খুশি হ'ত সে বেশি। আরও, আরও ডুবে যেতে চায় সে। আরও নিচে। আর কখনও, আর কোন দিন জাগতে না হ'লেই যেন সে বাঁচে।

আসল কথা, যে বস্তুকে অবলম্বন ক'রে সে এত কাল খেটে এসেছে ভূতের মত, নিজেকে বঞ্চিত করেছে নির্ম্মম ভাবে, কুমারী জীবনের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দলিত পিষ্ট ক'রে জীর্ণ পত্রের মত ফেলে দিয়েছে জীবনের পথপ্রান্তে, অন্তর-শতদলকে বাস্তবের প্রখর তাপে শুষ্ক করেছে দিনের পর দিন —সেই অবলম্বনই আজ তার খ'সে পড়েছে। যেটাকে সে এতকাল ধ'রে মনে মনে সযত্নে লালন ক'রে এসেছে—আদর্শ ব'লে, জীবনের সার ব'লে জেনে এসেছে, আজ জেনেছে সেটা একেবারেই ভুয়ো, অন্তঃসার-শূন্য।

কর্ত্তব্য! হ্যাঁ, এতকাল প্রাণপণে ঐ একটি শব্দই জপ ক'রে এসেছে সে। যখন বুকটা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যেতে চেয়েছে, উন্মত্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ভগবানের অবিচারের বিরুদ্ধে—তখন সে শুধু ঐ একটি শব্দ দিয়ে মন শান্ত করেছে, কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য পালন করেছে। কিন্তু আজ বুঝেছে যে কর্ত্তব্য নয়—কর্ত্তব্যের অহঙ্কারকেই সে এতকাল পূজো ক'রে এসেছে। ওটা তার আত্মম্ভরিতা, বৃথা গর্ব্ব—ইংরেজীতে যাকে বলে ভ্যানিটি, তাই। তা নইলে আজও, এতকাল পরেও সামান্য আঘাতে ওর এতকালের ক্ষুধা এমন ক'রে জেগে উঠত না—আকণ্ঠ তৃষা নিয়ে এমন ক'রে জেগে উঠত না ওর উপবাসী কুমারী-অন্তর। এমন সর্ব্বনাশা ও প্রচণ্ড দাহ অনুভব করত না মনে মনে।

কর্ত্তব্য পালন করছে ব'লে ওর অহঙ্কারই তৃপ্ত হয়েছে শুধু এতকাল। ও কি সত্যিই স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছিল? সত্যিই কি নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিতে পেরেছিল পরের সুখের জন্য? মিছে কথা। ঘরে বাইরে অজস্র বাহবা ও হাততালিতে স্তুতিবাদের নেশা লেগেছে ওর, আর মনকে ও বুঝিয়েছে যে, ওরা যা বলতে চাইছে তাকে—সে তাই।

আর হ'লও ত দীর্ঘকাল। ভাল ক'রে মনেই পড়ে না অতসীর, কবে এ ভার নিয়েছে সে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে। ওর বাবা যখন মারা যান তখন সে নিজেই ছোট, ক্লাস এইট্-এ পড়ছে। বিশু এবং আল্পনা আরও ছোট। আল্পনা তখন চার পাঁচ বছরের মেয়ে। মনে আছে ওর মা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন—'তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস্ তবু আশা থাকত যে দু'বছর পরেই রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবি। এমন কপাল —জ্যেষ্ঠ সন্তান হ'ল কিনা মেয়ে। ঐ যে বলে না, যে আঁটকুঁড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে, আমার হয়েছে তাই!'

অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল অতসী সেদিন। মায়ের কথাগুলো সত্যিই যেন শেলের মত বিঁধেছিল। সেই দিনই ও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, চিত্রাঙ্গদার মত কন্যা হয়ে জন্মাবার এ কলঙ্ক সে ঘোচাবেই। সেই হ'ল অহঙ্কারের সূত্রপাত। সে দিন থেকে সে অহঙ্কারকেই লালন ক'রে এসেছে সারা জীবন।

বাড়ীটা ছিল নিজেদের। নিচের তলায় ভাড়াটে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—মাসিক ত্রিশ টাকায়। আর চলল মা'র গহনা বেচে। প্রাণপণে লেখাপড়া করে অতসী, বাড়ীর কাজও করতে হয়, ঝি-চাকর রাখার সঙ্গতি নেই। বাসন-মাজা থেকে নর্দ্দমা ধোওয়া পর্য্যন্ত কোন কাজই বাকি রাখে না সে। তার মা শুধু রান্না করতেন, তাও তাঁর অসুখ হ'লে সে কাজটাও চাপত ওর ওপর। নিজের ওপর সমস্ত ভার, সমস্ত কৃচ্ছ্রতা ইচ্ছা ক'রে তুলে নিয়েছে সে—ছোট ভাইবোনদের কোন ভাগ নিতে হয়নি। মনে হয়েছে, 'আহা ওরা ছেলে মানুষ, অনাথ—আমি যে কষ্টটা পাচ্ছি জীবনে, ওরা না পায়।' ওরই ফাঁকে সে ওদের পড়িয়েছে আবার, অবশ্য যতটা পেরেছে। এই ভাবে

নিজের বিশ্রাম থেকে অনেকখানি সময় সরিয়ে এনে পরিশ্রম ক'রে গেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। একভাবে—অক্লান্তভাবে। সবাই ধন্য ধন্য করেছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে পথে ঘাটে—হ্যাঁ, মেয়ে বটে! ওর অহঙ্কার চরিতার্থ হয়েছে।

পাশও করেছে অতসী ভালভাবেই। তারপর নিজেই চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে সে। বাবার আফিসে গিয়ে দেখা করেছে বড় সাহেবের সঙ্গে। সমস্ত বিবরণ খুলে বলেছে তাঁকে। তিনি ওদের কিছু খবর রাখতেন, এখন ওর মুখে পূর্ণ ইতিহাস শুনে, ওর মুখের দিকে চেয়ে তার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য ব'লে বুঝতে পেরে সেই দিনই, তখনই চাকরী দিয়েছেন। বিজয়িনী অতসী বাড়ী ফিরে এসে যার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে—সেই আঘাতের, এতকাল পরে। মেয়ে হওয়ার জন্য কিছু আটকায়নি তার, জ্যেষ্ঠের সব দায়িত্বই সে বহন করতে পেরেছে, আর করবেও—চিরকাল। সে দিন সে কী আত্মতৃপ্তি ওর —কী অনির্ব্বচনীয় আত্মস্ফীতি!

•

তারপর এই দীর্ঘকাল ধ'রে চলেছে সেই একটানা ইতিহাস। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে বৎসরে ও আবর্ত্তিত হয়েছে সেই একই অহংকারের কক্ষপথে। ওর যুদ্ধ, ওর আত্মনিগ্রহ থামেনি সেখানেই। প্রাইভেটে প'ড়ে ও আই-এ পাশ করেছে চাকরী করতে করতেই। তার সঙ্গে করেছে টিউশনি। এধারে আফিসে বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে চাকরীর ক্ষেত্রেও এগিয়ে গেছে অনেকটা। এর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু উপায় কি ছিল? সংসারের খরচা বেড়ে গেছে, ভাই-বোনদের ইস্কুল-কলেজের মাইনে যোগাতে হয়েছে—পড়ার রকমারী খরচা। বিশু পড়েছে হেয়ার স্কুলে,

প্রেসিডেন্সি কলেজে—ওরা না বলতে পারে কোনদিন যে, বাপ ছিল না ব'লে ভাল ইস্কুল কলেজে ওদের পড়া হয়নি। বিশু বরং ম্যাট্রিক পাশ করার পর প্রস্তাব ক'রেছিল যে চাকরী করতে করতে ও রাত্রে কলেজে পড়বে কিন্তু অতসী কিছুতেই রাজী হয়নি। প্রস্তাবটা সেদিন লোভনীয়ই ছিল, কারণ যুদ্ধের বাজারে খরচাটা যে ভাবে বাড়ছিল সেভাবে আয় বাড়েনি, পুরোনো ভাড়াটে কিছুতেই ভাড়া বাড়াতে রাজী হয়নি—আফিসের মাগ্‌গি ভাতা বেড়েছে ধীরে ধীরে, শামুকের গতিতে। তবু অতসী বিশুকে সে স্বার্থত্যাগ করতে দেয়নি, —স্বার্থত্যাগের অহঙ্কার ও কারুর সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে রাজী নয়। সে বৃথা গর্ব্ব শুধু ওরই চরিতার্থ হওয়া চাই। সে জন্যে সে সকালে বিকেলে দুটো তিনটে ক'রে টিউশ্যনী করেছে নিজে। বিশুকে টিউশ্যনী পর্য্যন্ত করতে দেয়নি। এরই ভেতর নিজে বি-এ পাশ করেছে, টিউশ্যনীর মূল্য ও মর্য্যাদা বেড়েছে—তাতে ওদের খরচা চ'লে গিয়েছে কোন রকমে। কষ্ট হয়েছে ওর ? তা হোক্—ভাই বোন না কোনদিন, কোন রকম অনুযোগ করতে পারে, তাদের বাবার অভাব না অনুভব করে তারা। সবাই ধন্য ধন্য করেছে ওর এই স্নেহ দেখে, ওর এই আত্মত্যাগে।

কিন্তু এটা কি ওর সত্যই স্নেহ, সত্যই আত্মত্যাগ ? তা হ'লে আজ ওর এই সুগভীর ক্লান্তি আসবে কেন ? কেন আসবে এই শূন্যতা-বোধ। কেন এই অপরিসীম তিক্ততা ওর জীবনের পাত্র উপ্‌ছে পড়তে চাইবে !

আজ বরং ওর আনন্দের দিন। আজ ওর জীবনের ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। ভাই-বোনেরা মানুষ হয়ে উঠেছে। ভাই বিশু বি-এস-সি পাশ ক'রে সরকারী চাকরীতে ঢুকেছে। সুন্দর বলিষ্ঠ তার দেহ, সরল ঋজু, তরুণ শালগাছের মতই ঋজু তার চেহারা—তেম্‌নি স্বাস্থ্য। দীর্ঘ দোহারা গঠন, মুখে চোখে

স্বাস্থ্যের, প্রাণের, আনন্দের প্রাচুর্য্য। বিশুর দিকে রাস্তার লোকেও ঈর্ষিত হয়ে তাকিয়ে দেখে। তেমনি চরিত্রবান্ সে—ভদ্র, নম্র, আদর্শবাদী ছেলে। ওকে আরও পড়াবার ইচ্ছা ছিল অতসীর, তাহ'লে বোধ হয় ওর অহঙ্কার আরও চরিতার্থ হ'ত কিন্তু বিশু কিছুতেই রাজী হয়নি। হয়ত তার লজ্জাই করেছিল দিদির উপার্জ্জনে এতকাল স্বচ্ছন্দে থাকতে—তবে কারণ দেখিয়েছিল সে—ভাল লাগছেনা ব'লে!

আল্পনা বা আপুও আই-এ পাশ করেছে। বি-এ পড়বার কথা—কিন্তু তার আগেই এই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পাশের বাড়ীর রাজেনবাবুর ভাগ্নে। পাটনায় বাড়ী নিজেদের, বাপ সরকারী ইঞ্জিনিয়ার—ছেলে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে এখানেই চাকরী পেয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে কিছুদিন মামার বাড়ী ছিল। সে দেখেছে আপুকে, আপুও তাকে দেখেছে। সম্বন্ধটা এসেছে ও পক্ষ থেকেই, অযাচিত ভাবে। অশোকের বাবা নিজে বিনীত ভাবে চিঠি দিয়েছেন, রাজেনবাবুও এসে অনুরোধ ক'রে গেছেন। এ সৌভাগ্যকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। অতসী ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ তুলেছিল বি-এ পাশ করার অজুহাত দেখিয়ে, কিন্তু মা একেবারে অন্নজল ত্যাগ করেছেন। বিশুরও অশোককে খুব পছন্দ—সব চেয়ে বড় কথা আপুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল অতসী আপত্তি করাতে। সুতরাং অতসীকে সে বাধা সরিয়ে নিতে হয়েছে—বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে মাত্র তিনটি দিন পরে বিয়ে।

বাস্তবিকই আনন্দের কথা এটা। আপত্তিটাই বরং ছিল অনর্থক, অকারণ। অশোকের মত পাত্র দুর্লভ, তপস্যার ফল। রূপবান, সচ্চরিত্র, কৃতী, অল্পবয়সী ও অবস্থাপন্ন। তার ওপর এক পয়সাও ওঁরা নগদ নিচ্ছেন

না। গহনার কথাও ওঁরা কিছু বলেন নি—যা দিচ্ছে অতসী, স্বেচ্ছায় দিচ্ছে। বিবাহ স্থির হওয়ার পর থেকে আল্‌পনার ফুলের মত সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে, আরও উজ্জল হয়ে উঠেছে। আসন্ন সুখের আভাসে ঝলমল করছে সে। হ্যাঁ, আজ ওর আনন্দেরই দিন! .

কিন্তু অতসীর এ কী হ'ল?

অকস্মাৎ এ কী দম্‌কা হাওয়া এসে ওর এতদিনের সযত্ন-পালিত মহীরুহকে এমনভাবে কাঁপিয়ে দুলিয়ে গোড়া সুদ্ধ আল্‌গা ক'রে দিয়ে গেল!

অথচ কারণটা কী এবং কোথায় তা এখনও খুঁজে পাচ্ছে না অতসী। কী তুচ্ছ উপলক্ষ্যেই না ব্যাপারটা শুরু হ'ল! অশোকের জামা করাতে হবে, জুতোর অর্ডার দিতে হবে, সে জন্য অশোককে দরকার। ওরা যখন বলতে গেলে কিছুই চাচ্ছে না, তখন এ জিনিষগুলো ভাল-দেখেই দেওয়া উচিত। তা ছাড়া, আপু যে ওর বড় আদরের; ফুলের মত নরম, ফুলের মতই নির্ম্মল মেয়ে—ওর সেই এতটুকু ছোট্ট তুলতুলে বোনটি। তার বিয়েতে উৎসব সমারোহ করবারই কথা ওর। সারা কলকাতা সহরটা যদি উৎসবের চন্দ্রাতপে ঢেকে দিতে পারত ত খুশী হ'ত অতসী। সে ক্ষমতা নেই বটে—তবু যতটা সম্ভব, কোন খুঁত রাখবে না ও।

কিন্তু অশোকের এসব ব্যাপারে বড় আপত্তি। তার বিষম লজ্জা—কন্যাপক্ষের সঙ্গে দোকানে দোকানে মাপ দিয়ে বেড়াতে। বিশুকে দু'দিন পাঠিয়েছিল অতসী ওর কাছে, অশোক আসেনি। বিশুরও নতুন চাকরী, রোজ রোজ আগে বেরোন সম্ভব নয় ওর। সুতরাং অতসীই সেদিন এক

কাণ্ড ক'রে বসল—আফিস থেকে খানিকটা আগে বেরিয়ে সটান্ গিয়ে হাজির হ'ল অশোকের আফিসে—'আপনাকে একটু কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে যেতেই হবে অশোকবাবু!'

অশোক ত অবাক্। এটা সে মোটেই আশা করেনি। তার কাছে অভাবনীয় সম্মান ব'লেই মনে হয়েছে। অত্যন্ত নার্ভাস হ'য়ে সে গলার কাছে টাইটার বাঁধন আল্‌গা করার একটা চেষ্টা করতে করতে বললে, 'নিশ্চয়ই যাবো—কিন্তু এর কী দরকার ছিল বলুন ত! ছি ছি, আপনি নিজে কষ্ট ক'রে এই এতদূর—আপনারা সব পাগল এক একটি। এমন জানলে আমি কাল বিশুবাবুর সঙ্গেই—না না, এ বড় অন্যায় হ'ল—'

বিব্রত অশোকের দিকে অতসী চেয়েছিল বোধ হয় একটু মুগ্ধ নেত্রেই। সুন্দর মানাবে আপুর সঙ্গে কিন্তু। বিলিতি পোষাকে বাঙ্গালীর ছেলেকে এত মানাতে দেখাই যায় না বড় একটা। বয়সও অল্প, তারুণ্যের কাঁচা সতেজতা ওর চোখে-মুখে। সত্যিই ছেলেমানুষ। নইলে এই তুচ্ছ ব্যাপারে এত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে! মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে বেচারীর। ঘেমে উঠেছে এরই মধ্যে। পাখার নীচে ব'সেও কপাল ও গলা ভিজে উঠেছে ওর—

নিজেই সহজ ক'রে আনে অতসী ব্যাপারটা, 'তাতে কী হয়েছে। আমারই ত আসা উচিত। আমিই যখন ওদের অভিভাবক বলতে গেলে। তা ছাড়া বিশু ছেলেমানুষ, হয়ত পারতও না ঠিক ম্যানেজ করতে। আপনি, আপনি একটু আগে বেরোতে পারবেন না?'

'ও ইয়েস্, সার্টেন্‌লি। এখনই উঠ্‌ছি। চলুন। শুধু একমিনিট একটা কথা ব'লে আসি আমার য়্যাসিস্ট্যাণ্টকে। যদি কিছু মনে না করেন! ততক্ষণ এই সি—সরি, একটা কাগজ টেনে পড়ুন না!'

উদ্যত সিগারেটের প্যাকেটটা দমন ক'রে আরও অপ্রতিভ অশোক বেরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু অতসীর কাগজ পড়া হয় না। সে চেয়েই থাকে তেমনি একভাবে, পার্টিশনের খোলা-দোরটার দিকে, যেখান দিয়ে অশোক বেরিয়ে গেল এইমাত্র।

আপন মনেই মনে না ক'রে পারে না অতসী, 'আপুটার সত্যিই পছন্দ আছে, মান্‌তে হবে। দিব্যি মানাবে দুটিকে।...আহা, ওরা সুখী হোক্।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর। হয় ত নিশ্চিন্ততারই নিঃশ্বাস সেটা—আরামেরই নিঃশ্বাস! কে জানে! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অশোক এসে পড়েছে—দু' মিনিটের মধ্যেই। ওদের উঠ্‌তে হয়েছে তখনই।

আসবার সময় বাস্-এ এসেছিল কিন্তু এখন সে প্রস্তাব তুলতেই লজ্জা হ'ল অতসীর। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল।

দীর্ঘপথ, তায় মোষের গাড়ী ও লরীতে পথ রুদ্ধ। চৌরঙ্গীতে পৌঁছুতে বহু সময় লাগল ওদের। ইতিমধ্যে অশোক অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। এর আগে অতসীর সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি আলাপ হয়নি ওর কোন দিনই। এতদিন শুধু অতসীর খ্যাতিই শুনেছিল। তার স্নেহের, তার আত্মত্যাগের, তার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার, কঠোর সাধনার নানা কাহিনী অতসীর চারপাশে একটা দীপ্তির আবরণ গ'ড়ে তুলেছিল ওর মনের মধ্যে। সেই অতসীকে আজ সাম্‌না-সাম্‌নি অমন আকস্মিকভাবে দেখেই অতটা নার্ভাস হ'য়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু পথে যেতে যেতে তার সস্নেহ কথাবার্ত্তায়, বুদ্ধি-দীপ্ত রসিকতায় এবং সহজ আত্মীয়তাবোধে লজ্জার তুষার গল্‌তে থাকে অশোকের। মনের সুখে সে ব'কে যায় অতসীর কাছে—ওর নিজের কথা, ওর পরিবারের কথা, ওর বাবার কথা। ওর মা আজ বেঁচে থাকলে কত সুখী হ'তেন—তিনি ওর

স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি ছেলেবেলা থেকেই। ওর বাবাও কখনও শাসন করেননি ওকে, বাল্যকালে কোন অপরাধ ক'রে ফেললে তিনি কাছে ডেকে বুঝিয়ে দিতেন ওর অপরাধের গুরুত্ব। লজ্জা দিয়ে ওকে অনুতপ্ত ক'রে তুলতেন। ওর একটি দিদি আছে, অতসীর মতই কতকটা সে। পাটনার বাড়ী ওদের কি রকম, সেখানে কে কে আছে। বিয়ের পর ওরা কি করবে—আগ্রাতে ও কাশ্মীতে যাবে হনিমুন করতে, তা সে যে যাই বলুক। সাহেবিয়ানা বলবে হয়ত অনেকে। তা বলুক। এ ওর বহু-দিনের স্বপ্ন।

এখান থেকে বদলী হ'য়ে যাবে অশোক, বিয়ের পরই। অনেক উন্নতি হবে ওর, পদবীর দিক থেকে ত বটেই—মাইনের দিক থেকেও। এটা বহুদিনই পেত সে, শুধু এই বিয়েটা স্থির না ক'রে কলকাতা থেকে নড়তে পাচ্ছিল না সে, সেইজন্য নিজেই ইচ্ছে ক'রে নিজের প্রমোশন পেছিয়ে দিয়েছে সে। দিল্লীতে বিরাট কোয়ার্টার পাবে নিশ্চয়ই। সেখানেই ও স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রাখবে, আর বাবা যদি যেতে চান ত বাবাকেও—

এম্‌নি কত কি! ভবিষ্যতের নানা সুখস্বপ্ন, সোনালি কল্পনা।—অতীতের কত বিচিত্র সুখাস্বাদ! তন্ময় হয়ে শুনছিল অতসী, একমনে। অশোকের বাঙ্ময় তুলির প্রতিটি রেখার অনুবর্ত্তন করেছে তার মন এতক্ষণ ধ'রে, সে ছবি স্পষ্ট, উজ্জ্বল হ'য়ে অপূর্ব্ব বর্ণাভায় ফুটে উঠেছে তার মানসপটে।

তার ফলে চৌরঙ্গীতে পৌছে গাড়ী থেকে নেমেছে অতসী অভিভূতের মতই। কবিরা যাকে স্বপ্নোত্থিতবৎ বলেছেন—কতকটা তাই। সেই রকম অন্যমনস্কভাবেই ও ব্যাগ খুলে ভাড়া দিতে গেছে। ও লক্ষ্যও করেনি যে অশোকও পার্স বার করেছে সঙ্গে সঙ্গে—দুটো হাতই একসঙ্গে প্রসারিত

হয়েছে ড্রাইভারের দিকে। ওর চমক্ ভাঙ্গল যখন বাঁ হাত দিয়ে ওর প্রসারিত ডানহাতটা সরিয়ে নিজের টাকাটা গুঁজে দিলে অশোক, দু-এক টাকা বেশীই হয়ত।

'বা রে! কী পেয়েছেন আমাকে, আমি বুঝি পেশাদারী জামাইয়ের মত? ওটাকা তুলে রাখুন দিকি আগে।'

ঘুম থেকে জেগে ওঠে যেন অতসী এতক্ষণে, 'সে কি, এটা ত আমারই দেবার কথা। তা ছাড়া এখনও ত আমি দস্তুরমত শালী হইনি যে ভগ্নিপতির পয়সা খসাবো অকারণে! তখন দেখবেন—গাড়ীভাড়া দিয়ে পেরে উঠবেন না!'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন। এখন চলুন ত। এমনিই যা বিশ্রী লাগ্‌ছে আমার। এই সব প্রথাগুলো কেন যে আপনারা ছাড়তে পারেন না!'

'মশাই, এসব প্রথা আপনার সাহেবী মুলুকেও আছে। জামাইকে উপহার দেওয়া কোন্ দেশে নেই তাই শুনি?'

'আমাদের সাহেবী মুলুক! বেশ ত!' হা হা ক'রে হেসে ওঠে অশোক। সরল দিল-খোলা প্রাণবন্ত হাসি। বলিষ্ঠ দেহ এবং নির্ম্মল মন না হ'লে বোধহয় এমন হাসি বেরোয় না। আস-পাশের লোক চম্‌কে চেয়ে দেখে ওদের দিকে।

অতসীও হাসতে হাসতে একটু জোরে পা চালায়। নইলে ওর সঙ্গে তাল রাখা শক্ত। কিন্তু পথ চলতে চলতেই সে যেন একটু অবাক হ'য়ে আড়ে তাকায় নিজের বাঁ হাতের দিকে, যেটা এই মাত্র চেপে ধরেছিল অশোক। বলিষ্ঠ, উত্তপ্ত হাত, মনে হয় এমন হাতের বন্ধনে নিজের হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেলেও দুঃখ নেই।

পুরুষ ও এতদিন দেখেছে ওর আফিসের তরুণ কেরাণীদের। তাদের অনেকেই এসেছে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। তাদের দেখে ঘৃণা হয়েছে ওর এতকাল—সমগ্র পুরুষ জাতের ওপরই বোধ হয়। এমন পুরুষ ত তারা কেউ নয়। দু-একজন সেখানেও হাত ধরবার চেষ্টা করেছে বৈ কি। কেমন যেন ওর মনে হয়েছে সেগুলোকে নির্জীব, ক্লীবের হাত, সে স্পর্শ ক্লেদাক্ত।

একটা বড় সাহেবী দোকানেই ঢুকেছিল ওরা। মাপ দেওয়া হ'ল স্যুটের। কিন্তু মারামারি বাধল কাপড় পছন্দ করা নিয়ে। অশোককে পছন্দ করতে বলায় সে পছন্দ করে সব চেয়ে কম দামের কাপড়। সেটা নাকচ ক'রে দেয় অতসী। সে নিজেই পছন্দ করতে বসে। সব চেয়ে দামী যে সব কাপড় ওর পছন্দ হয়—নানা ছুতোয় অশোক সে-গুলো অপছন্দ করে। এই নিয়ে কৌতুকের ঝগড়া হয় ওদের। সস্নেহ তিরস্কার করে অতসী। মান অভিমানের পালাও হয়ে যায় ছোটখাটো। অশোক যেন এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর আত্মীয় হয়ে উঠেছে—বিশুর মতই সরল এবং মমতাময় মনটি ওর।

এখানকার পালা শেষ ক'রে ওরা যায় ধর্ম্মতলায় একটা বড় পোষাকের দোকানে। এখানে নাকি পাঞ্জাবীর মাপ দিতে হবে। একটা গরদ, একটা মটকা।

প্রতিবাদ করে অশোক প্রবল ভাবে, 'এ আবার কী? এ কি হবে? পাঞ্জাবী ত আমি পরি না।'

'সেই জন্যই ত করানো দরকার। এখন থেকে ত পরতে হবে। শ্বশুর বাড়ী আসবে কী সাহেবী পোষাক প'রে?'

কখন যে 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয়ে গেছে, অতসী তা লক্ষ্যই করেনি। একেবারেই বিশুর মত, নিতান্ত কাঁচা। ওকে একশ বার 'আপনি' বলতে মুখে বাধে যেন।

অশোক বললে, 'ও, সে আমার আছে ঢের—'

'তবে যে বলছিলে পরোনা কখনও?'

'মানে পূজোর সময় ত দু'একদিনও পরতে হয়! বাবা তৈরি করিয়ে দিয়েছেন যে! আর বেশি কি হবে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। আর পাকামো করতে হবে না। সুবোধ বালকের মত মাপটা দাও দিকি।' ধমক্ দেয় অতসী।

অশোক হতাশ ভাবে হাল ছেড়ে দেয়, 'নিন্ মাপ যত খুশি, যেমন ভাবে খুশি।'

কাপড় পছন্দ করতে গিয়ে অতসী সব চেয়ে দামী কাপড়ই পছন্দ করে। এতটা ওর কল্পনা ছিল না আগে, এস্টিমেটের অনেক বেশিই পড়ে যায়। কিন্তু কোনমতেই সব চেয়ে যা সেরা জিনিস তা ছাড়া ও পছন্দ করতে পারে না। এমন ছেলে ওর ভগ্নিপতি হ'তে যাচ্ছে, ওর আপুর বর—তাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাড়া অন্য কোন জিনিস দিতে ওর মন চায় না।

বারবার অনুযোগ করে অশোক, 'আপনি এ কী পাগলামী করছেন বলুন ত! কত খরচ করছেন আপনি? এত দামী জামা কি আমার পরা সাজে! এ কী কাণ্ড!'

অতসী কিন্তু হেসেই ধমক্ দেয়, 'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। তুমি যে

আমার আপুর বর। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী আমার কাছে কে আছে? আমার সেরা মণি যে তোমার হ'তে যাচ্ছে।'

তারপর গুন্ গুন্ ক'রে আপন মনেই আবৃত্তি করে, কতকটা খাপছাড়া ভাবেই—

'মাগো রাজার দুলাল চলি যাবে মোর
ঘরের সুমুখ পথে,
বক্ষের মণি ফেলিয়া না দিয়া
রহিব বলো কি মতে!'

'আপনি যা শুরু করেছেন—আমাকে আর ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতে দেবেন না দেখছি!'

সত্যিই সে লাল হয়ে ওঠে, লক্ষ্য ক'রে দেখে অতসী। সুগৌর সুন্দর মুখে যেন কে আলতা ঢেলে দিয়েছে, কলারটা ভিজে উঠেছে ঘামে, ঘন ঘন মুছেও ললাটটা শুষ্ক থাকছে না। একটু যেন নির্লজ্জ ভাবেই চেয়ে থাকে অতসী। মনকে নিজের অবচেতনেই বোঝায় যে এটা ওর নিছক কৌতূহল। যাঁর ওপর ওর বোনের সারা জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করছে তার সম্বন্ধে এ কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক।···

রাস্তায় বেরিয়ে অশোক বলে, 'এতক্ষণ আমাকে দিয়ে যা খুশী করিয়েছেন, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন।···এইবার আমি খানিক ঘোরাব।'

শঙ্কিতভাবে অতসী বলে, 'সে আবার কি? কোথায় নিয়ে যাবে?'

'চলুন কোন ভদ্র জায়গা দেখে চা খেয়ে আসা যাক্।···না না ওসব কোন কথা শুনবো না।'

অতসী রীতিমত বিপন্ন হয়ে ওঠে, 'এ প্রস্তাবটা ত আমারই করা উচিত ছিল।...কিন্তু তুমি আমার অতিথি মনে থাকে যেন!'

'না', বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই উত্তর দেয় অশোক, 'সে যখন সম্বন্ধ পাকা হবে তখন—এখন আমি পুরুষ মানুষ আপনার অতিথি হয়ে খাবো কেন? এখন আপনিই আমার অতিথি। এই ট্যাক্সি!'

'আবার ট্যাক্সি কি হবে?'

'একটা ভাল জায়গায় যেতে হবে ত। এখানে কোথায় খাবো—?'

ট্যাক্সিতে ব'সে যেন এলিয়ে পড়ে অতসী। সেই ওর প্রথম ক্লান্তির স্থত্রপাত। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটু যেন অনুতপ্ত কণ্ঠেই অশোক বলে, 'বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, না? দেখুন ত মিছি মিছি এ কি ছুটোছুটি! এমন জানলে—'

'না না—ক্লান্ত টান্ত বাজে কথা। আজ খুব ভোরে উঠেছিলুম তাই।' জোর ক'রে সোজা হয়ে বসল অতসী।

'আহা—তাই ব'লে উঠতে কে বললে! বেশ ত ততক্ষণ একটু শুয়ে ছিলেন—' তারপরই ছেলে-মানুষের মত হঠাৎ ব'লে ফেললে, 'আপনি ঐ রকম অবসন্ন ভাবে পড়েছিলেন পেছনের গদীতে হেলান দিয়ে, পশ্চিমের রাঙা আভাটা এসে পড়েছিল মুখে; বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু—ঠিক যেন কোন বড় আর্টিস্টের আঁকা ছবির মত!'

'ও আবার কি অসভ্যতা! ঐ সব কম্‌প্লিমেণ্ট বুঝি আমাকে দিতে আছে?' ভ্রুকুটি করে অতসী। কিন্তু কতটা লজ্জায় আর কতটা সত্যিকারের আনন্দে ও লাল হ'য়ে ওঠে তা বলা শক্ত।

'মাপ ক'রবেন। কিন্তু আমি ঠিক অতটা ভেবে বলিনি সত্যিই।

নিরর্থক কম্প্লিমেণ্ট দেওয়া আমার স্বভাব নয়। যখন যা মনে আসে ব'লে ফেলি এই আমার দোষ।' লজ্জিত হয়ে ওঠে অশোক রীতিমত।

ততক্ষণে পার্কস্ট্রীটের একটা সাহেবী রেস্তোরাঁর সামনে এসে পড়েছে ওদের গাড়ী। পর্দ্দাঘেরা একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে ব'সে অশোক প্যাসট্রি আর চা ফরমাস করলে। নিজের জন্যে এক কাপ কফি।

অতসী বললে, 'আমি কিন্তু চা ছাড়া আর কিছু খাবো না। আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।'

'ঐ বড় আপনাদের কুসংস্কার। মেয়েছেলের ক্ষিদে পেলেও স্বীকার করতে নেই—এমন কথা কে আপনাকে শিখিয়েছে? খেতে কিছু হবেই। এদের কেক্ প্যাসট্রি খুব বিখ্যাত। বরং আর এক প্লেট স্যাণ্ড্উইচ আনাই।'

সত্যই ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছিল অতসী। খেতে খেতে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। জোর ক'রে খানিকটা কফিও খাওয়ায় অশোক। হাস্য পরিহাসে আন্তরিকতায় কোথা দিয়ে আরও ঘণ্টাখানেক কেটে যায় তা কেউই বুঝতে পারে না। ওরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরোয় তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বেরিয়ে এসে অশোক বললে, 'আমি কিন্তু বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবো না আপনাকে। একাই যেতে হবে।'

মুখ টিপে হেসে অতসী বলে, 'কেন?'

'হ্যাঁ—এখন ও পাড়ায় গেলে লোকে বলবে কি? সে আমি পারবো না।' ছেলেমানুষের বেহদ্দ যেন অশোকটা।

'আচ্ছা, তাই হবে। কাল কিন্তু আমার আফিসে এসো ঠিক সময়ে।'

'সে আবার কি? কেন?'

'বা—জুতোর মাপটা যে দিতে হবে!'

'সে যা হয় করবেন। কাগজে এঁকে দেবো এখন বিশুবাবুকে।'

'না না—সে হয় না। কাল একবার আসতেই হবে।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে অতসী।

'আসতেই হবে?…আচ্ছা, তা না হয় আসব। মন্দ নয়—মানুষটা আপনি ভালই। মন্দ কাট্‌ল না আজকের বিকেলটা। শালী-ভাগ্য আমার ভালই দেখছি।'

'আবার!'

'আচ্ছা আচ্ছা। ট্যাক্সী ডেকে দেবো?'

'না, অত পয়সা সস্তা নয় আমার। বাসেই ফিরবো।' একটা বাসে উঠে প'ড়ে চেঁচিয়ে বলে, 'সাড়ে চারটের মধ্যে, মনে থাকে যেন!'

বাড়ীতে ফিরতে সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল, 'এত দেরি যে!'

আল্‌পনার গালটা টিপে দিয়ে বললে অতসী, 'পোড়ার মুখী, তোর বরের সঙ্গে ঘুরছিলুম যে!'

'সে কি? আরে, তাকে পেলে কোথায়?' বিশু চেঁচিয়ে ওঠে।

'তুই ত পারলি না, আমি গিয়ে তাকে আফিস থেকে ধ'রে এনে পোযাক আর জামার মাপ দিয়ে এলুম। কাল এসে জুতোর মাপও দিয়ে যাবে।'

'তাই নাকি! কন্‌গ্র্যাটস্‌! তুমি ত দিদি সব বিষয়েই সাক্‌সেস্‌ফুল! তোমার এফিসিয়েন্সি বিয়ণ্ড ক্রিটিসিজ্‌ম্‌।'

সবাই হৈ হৈ করতে থাকে কিছুক্ষণ ধ'রে।

পরের দিন একটু যেন বিশেষ ক'রেই প্রসাধন করে অতসী। আগুন রঙের শাড়ীটা পরে অনেকদিন পরে। ওর উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গে শাড়ীর এই রংটা ভারী সুন্দর মানায়। যত্ন ক'রেই চুল বাঁধে ও। মনকে বোঝায় হাজার হোক নতুন কুটুম। কাল যা ছিরির পোষাকে গিয়েছিলুম ওর সামনে—লজ্জা করে যেন।

আফিসে বেরোবার সময় ঠিক সিঁড়ির মুখে মার সঙ্গে দেখা। মা যেন একটু অবাক্ হয়েই চেয়ে থাকেন ওর দিকে। তাঁর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে না পেরে অতসী প্রশ্ন করে, 'কী মা?'

'একটা কথা বলব?'

'বলো না।'

'বলছিলুম কি, আপুর বিয়ে হয়ে গেল, বিশুরও যা হোক্ হিল্লে হ'ল—আর কেন। এইবার তুইও বিয়ে-থা কর্।'

. 'হ্যাঁ—এই বুড়ো বয়সে! কী যে বলো মা।'

'ওমা, বুড়ো কি বল্! এরই মধ্যে তুই বুড়ো হ'লি! তোর চেয়ে ঢের বেশী বয়সে কত মেয়ে আজকাল বিয়ে করছে!···কী সুন্দর তোকে আজ দেখাচ্ছে বল্ দিকি, যেন লক্ষ্মী ঠাকুরুণটি।'

'তোমার মা ভিমরতি হচ্ছে যেন দিন দিন!' অতসী রাগ ক'রে বেড়িয়ে যায়।

ওর বেশ-ভূষা দেখে আফিসেও অনেক সহকর্মী ঠাট্টা করে, 'ব্যাপার কি মিস্ সেন?···আজ যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন মনে হচ্ছে। এত সাজ কিসের?'

অতসীও তীক্ষ্ণ কামড় দেয় ওর উত্তরে, 'আফিসের দিক্ জয় করার জন্যে অন্তত নয়। সে জন্যে আর বিশেষ সাজ-গোজের দরকার আছে কি? যুদ্ধ-যাত্রার আগেই ত সারেঙ্গার করতে চায়। অত আবর্জ্জনা জড়ো ক'রে রাখার মত জায়গা নেই ব'লেই ত বন্দী গ্রহণ করিনি। ·বিজয়িনী সবাইকে উপেক্ষা ক'রে চ'লে গিয়েছি।'

আজও যারা আশা রাখে ওর সম্বন্ধে, তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে। বিবাহিত একজন বলে, 'তবে উপলক্ষটা কি?'

'আজ যে আমার বোনাই আসবে আফিসে। নতুন হবু ভগ্নিপতি। বেশ-ভূষাটা তারই জন্যে।' নিজেই হাল্কা ক'রে দেয় কথাটা।

অশোক আজ সতর্ক হয়েছিল ব'লে মুখে কিছু বললে না কিন্তু অতসীর দিকে চেয়ে ওর দৃষ্টিতে যে প্রশংসা ফুটে উঠ্ল, তাইতেই না-বলা ভাষার সে স্তুতি অতসীর মনে পৌঁছে গেল। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, ওকে দেখেই 'চলো' ব'লে উঠে এল ব্যাগটা নিয়ে।

জুতোর মাপ দেওয়ার কাজ সামান্যই। সেটা সারা হয়ে গেলে অতসী বললে, 'আজ কিন্তু আমার চা খাওয়াবার পালা, আজ না বললে শুনছি না।'

'আমি না বল্‌বও না, আমি ত স্ত্রীলোক নই। সত্যিই আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

হোয়াইট্‌ওয়েের দোতলায় গিয়ে বসে ওরা জানলার ধারে, সামনা-সামনি। তখন প্রায় বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে, খুবই নিরিবিলি। আফিসের ছুটির

সময়, নীচে এস্প্লানেডের মোড় কোলাহল-মুখরিত হয়ে উঠেছে। সেদিকে চেয়ে থাকে অতসী। আজ যেন কিছুতেই ও অশোকের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। কী দেখ্‌বে সে চোখে তাই যেন আশঙ্কা। হয়ত আশাও করে সে, ওর দৃষ্টির মধ্যে কোন স্তুতি, কোন বিহ্বলতা দেখবার। আশাভঙ্গেরও ভয় আছে হয়ত।

আজ অশোকও তেমন জমাতে পারেনা। টুকরো টুকরো ছু একটা খুচ্‌রো আলাপ করে। রসিকতা করারও চেষ্টা করে কিন্তু কালকের সে প্রাণ-উচ্ছলতা আজ আর নেই। কেন যে একটা সঙ্কোচ অনুভব করে অশোক, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

দোকান বন্ধ করবার সময় হ'তে উঠ্‌তেই হয় ওদের। বেরিয়ে এসে অশোক বলে, 'এখন কি আর বাস্‌-এ উঠ্‌তে পারবেন? একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই না হয়।'

'থাক্‌ গে। তুমি বাড়ী যাও। আমার শরীরটা ভাল নেই, কেমন যেন মাথাটা ভার ভার লাগ্‌ছে, আমি একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বস্‌ব! এমন মধ্যে মধ্যে যাই আমি ছুটির পর।'

'বেশ ত, আপত্তি যদি না থাকে—চলুন না আমিও যাই।'

'তুমিও যাবে? চলো। সময় নষ্ট হবে না ত?'

'হয়ত কাজের কিছু ক্ষতি হবে কিন্তু সময় নষ্ট হবে এ আমি স্বীকার করব না।'

দুজনে ভীড় বাঁচিয়ে সাবধানে চলে পাশাপাশি। দু-একজন ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে ওদের দিকে চায়। তাদের চোখের ভাষা হচ্ছে, বেশ আছে এরা! কিম্বা—দু'টিতে মানিয়েছে বেশ!

গঙ্গার ধারে প'ড়েও অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান খুঁজতে অনেকটা হাঁটতে হয়। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যই নেই অতসীর। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে··· হাঁটতে হচ্ছে কি না তাও মনে থাকে না ওর। ভাল লাগে ওর অশোকের পাশাপাশি এমনি ক'রে হাঁটতে। পথটা যদি শেষ না হ'ত! আবার কিসের একটা আশঙ্কায় যেন বুকও কাঁপে ওর।

মনের মধ্যে কে যেন বলে, ভাল না ভাল না—এ ভাল না। অথচ সেই অন্তরীক্ষবাসীর সতর্কবাণীর সঙ্গে জেদ্ ক'রেই যেন অতসী এগিয়ে যায়। একটা নিদারুণ অভিমান ওর মনে—সেই সঙ্গে অসহ একটা স্পর্দ্ধা।

অবশেষে একটা গাছের গোড়ায় খানিকটা নিরিবিলি অথচ পরিষ্কার জায়গা পাওয়া যায়। ঘেঁষাঘেষি বসে ওরা। দু-একজন মাল্লা প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চায়। কিন্তু নৌকোয় ওঠ্বার উৎসাহ ওদের কারুরই নেই।

খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে থেকে অশোক বললে, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?'

'করো না।' অতি কষ্টে যেন উচ্চারণ করলে অতসী। ওর বুকটা বড্ড বেশি কাঁপছে আজ।

'আচ্ছা, আপনি আগে বিয়ে না ক'রে ছোট বোনের বিয়ে দিচ্ছেন কেন?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'না, এমনিই।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে অতসী বললে, 'তুমি ত আমাদের সব কথাই শুনেছ। এতদিন বিয়ের কথা ভাববার অবসরই পাইনি। তার আগেই ত তোমাদের বিয়ের কথা উঠল।'

'তাহ'লে এইবার করবেন ত ?'

'ও কথার কি এই অর্থ হয় ?' তিরস্কারের স্বর অতসীর কণ্ঠে।

'না—তা নয়। বিয়ে করা আপনাদের উচিত।'

'কেন উচিত ?'

উত্তর দিতে পারে না অশোক, বিব্রত হয়ে ওঠে।

অতসীই বলে আবার, 'এখন আর বিয়ের কথা ভাবা সম্ভব কি ? আমাকে সঙ্গিনী ক'রে জীবনে সুখী হতে চাইবে এমন নির্ব্বোধ লোক বোধ হয় আর নেই।'

'সে কি ! আপনাকে পেলে সৌভাগ্যবান মনে করবে নিজেকে, পুরুষের পক্ষে সেইটেই ত স্বাভাবিক।'

'ওটা ত কম্‌প্লিমেণ্ট তোমার !'

'আবার সেই কথা ! বলেছি ত অকারণ কম্‌প্লিমেণ্ট দেওয়া আমার অভ্যাস নেই। সত্যি কথাই বল্‌ছি।'

'দেখা যাক্। সে রকম কোন ভক্ত যদি কোন দিন আসে ত সে কথা বিবেচনা করব। তবে আপাতত সে আশা কম।'

দু-জনেই আবার চুপচাপ—বহুক্ষণ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, পশ্চিম দিগন্তে একটা আলোর আভামাত্র লেগে আছে তখনও পর্য্যন্ত। পিছনে দূর রাস্তায় বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে সার সার—সবটা জড়িয়ে যেন একটা আলো-আঁধারির মায়া।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে, একটু যেন অস্ফুট-কণ্ঠেই ব'লে উঠল অশোক, কতকটা আপন মনে,—'আপনার সঙ্গে আগে আমার আলাপ হয়নি কেন ? ...আমি, আমি কিন্তু আপনার দিকে ভালো ক'রে তাকাইওনি কোনদিন।'

অতসীর ঠোঁটে বার বার এই প্রশ্নটা ঠেলাঠেলি করতে লাগল যে আগে আলাপ হ'লেই বা কি হ'ত! কিন্তু সে প্রশ্ন আর করা হ'ল না। চুপ ক'রেই ব'সে রইল।

জোয়ার আসছে বোধ হয় নদীতে। গঙ্গার জল ছলাৎ ছলাৎ ক'রে আছ্‌ড়ে পড়ছে পাড়ে। তীরে যে নৌকোগুলো বাঁধা ছিল তারাও দূরে চ'লে গেছে। জাহাজে জাহাজে আলো জ্বলে উঠেছে, নৌকোয় নৌকোয় জ্বলেছে হ্যারিকেন। আকাশের তারার সঙ্গে তাদেরও ছায়া কাঁপ্‌ছে গঙ্গার জলে।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ওরা যে কখন আরও পরস্পরের কাছ-ঘেঁষে এসেছে তা কেউই বুঝতে পারেনি।

অন্ধকারে এক সময় ক্লান্ত অতসীর মাথা এসে ঠেকেছে অশোকের কাঁধে। ওর চুলের একটা মৃদু সুগন্ধ পাচ্ছে অশোক। অশোক ডান হাতে ওর একটা হাত তুলে নিয়েছে, বাঁ হাতটা বেড়ে গিয়েছে অতসীর পিছনে, তার অনেকখানিই ওর পিঠে ঠেকে রয়েছে কিন্তু হাতটা তবু ঠিক বেষ্টন করেনি ওকে।

বুক কাঁপছে অতসীর। নিজের কাঁধের পিছন দিকটা অশোকের বুকে লেগে রয়েছে, তাতে বেশ বুঝতে পারছে অতসী যে অশোকেরও বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ছে। অতসী যেন আস্তে আস্তে ঠেস্ দেয় ওর হাতে।

অকস্মাৎ বড় রাস্তা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড নতুন মোটর গাড়ী তীক্ষ্ণ হর্ণ বাজিয়ে চলে গেল, তারই শব্দে যেন চমক্ ভাঙ্গল অতসীর।

ছি, ছি—এ কী করছে সে! অশোক কি মনে করছে! এ কী কাঙ্গাল-পনা ওর!

সে সোজা হয়ে উঠে ব'সেই—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল।

অশোক একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, 'কী হ'ল?'

'চলো বাড়ী যাই। রাত হচ্ছেনা? ··আমাকে একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। অনেক কাজ—এতটা দেরী করা ঠিক হয়নি।'

হতচকিত অশোক বিহ্বলের মতই উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে রাস্তা পর্য্যন্ত। বহুদূরে একটা ট্যাক্সি আসছে, সেই দিকে যেন একটু অধীর হয়েই তাকিয়ে থাকে অতসী।

অশোক একটু মিনতির সুরেই ওকে বললে, কতকটা ভয়ে ভয়ে, 'কাল আর কি দেখা হবে না আপনার সঙ্গে?'

'না, তা কি ক'রে হবে। এক যদি বাড়ীতে আসো ত—'

'না না। সে বিশ্রী। আসুন না কালও একটু গঙ্গার ধারে।'

'কী হবে?' অতসীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সে দৃষ্টিতে যেন কিসের একটা চ্যালেঞ্জ!

'এমনিই। বড় ভাল লাগল আজ। আসুন লক্ষ্মীটি।'

'আচ্ছা আসব।'

'আপনার আফিসে যাবো?'

'না। এখানেই আসব—সাড়ে ছ'টা নাগাদ।'

ট্যাক্সি ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'আচ্ছা' ব'লে ওর দিকে আর না চেয়েই অতসী গাড়ীতে উঠে বসল।

কাল সারারাত অতসীর কেটেছে অদ্ভুত একটা অর্দ্ধচেতনার মধ্যে।

মনের চেহারাটা আর দেখতে বাকী ছিল না তখন, কোথায় এগিয়ে চলেছে তাও সে জানে। তার জন্যে মনেরই একটা অংশ কঠিন ধিক্কার দিতে থাকে। তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে দিয়ে অপর অংশটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সে অংশটা ওকে বলে, 'কেন, কিসের অন্যায়? চিরকাল আমিই শুধু আত্মত্যাগ ক'রে যাবো? মনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কামনাকে আমিই চিরকাল দমন ক'রে রাখব, আর সবাই সুখী হবে, যা খুশী করবে! কিসের অন্যায়, যদি জীবনে এতটুকু রোমান্‌স্—এতটুকু অমৃতাস্বাদ আমি আদায় ক'রে নিতে পারি? সময় থাকলে আমি আপুর স্বামী কেড়েই নিতে পারতাম, হয়ত এখনও পারি।···না হয় করলই আমার জন্য এতটুকু। না হয় থাক্‌না—দুদিনের এই সামান্য রোমান্‌স্‌টুকু আমার পাথেয় হয়ে। কী ক্ষতি?'

বার বার সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি খুবই বুড়ো হয়ে গেছে? সত্যি সত্যিই? কৈ, বলি-রেখা ত নেই কোথাও। আজও তেমনি সুন্দর আছে ও, তেমনি অপরাজেয়া—আঠারো বছর বয়সে যেমন ছিল! আজও পুরুষের বুকের রক্ত উত্তাল ক'রে তোলার মত লাবণ্য আছে ওর। তবে, তবে কেন সে-মূল্য সে পাবে না?

তবু বিবেকই প্রবল হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে আপনা থেকেই কথাটা জাগে, এ ভালো না, এ অন্যায়। এতে কারুর কোন কল্যাণ-ত নেই-ই—কোন আনন্দও নেই।

তবু এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে ছিল যেটা, সেটা হচ্ছে আজকের এই অপরাহ্ণের জন্য অধীর প্রতীক্ষা। সমস্ত দেহ মন তৃষাতুর, আর্ত্ত হয়ে ছিল আজকের সন্ধ্যার জন্য—

কাল ওর মাথাটা যখন এলিয়ে পড়েছিল অশোকের প্রশস্ত কাঁধে, বলিষ্ঠ পুরুষের গায়ের একটা গন্ধ পেয়েছিল ও, সমস্ত প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল সে আঘ্রাণ। সে স্মৃতি ওকে অবশ করেছে বারবার। ওর হাতের যেখানটা চেপে ধরেছিল সে প্রথম দিন, হাতের সেখানটা আজও যেন সেই স্পর্শচেতনায় থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে—

যেতেই হবে ওকে, কী এক দুর্বার অমোঘ আকর্ষণ ওকে টানছে। কোন বিবেক, কোন যুক্তি ওকে আটকে রাখতে পারবে না। অন্যায় জেনেও যেতে হবে ওকে। আজকে যাওয়ার অর্থ ও জানে, তারপর আর ফেরার পথ থাকবে না, পৃথিবীতে আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না কাল সকাল থেকে, তবু যেতে ওকে হবেই—

আজ সারা দিন কেটেছে ওর এই একই দ্বন্দ্বে। সকালে বাড়ী থেকে কাজের অছিলাতে বেরিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসেছিল চুপচাপ। খায়ওনি কিছু শরীর ভাল নেই ব'লে। আফিসেও কোন কাজ হয়নি। চুপ ক'রে ব'সে ভেবেছে ও শুধু। আর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মনের টানাটানিতে। দ্বন্দ্ব অথচ প্রতীক্ষা। অধীর, আকুল প্রতীক্ষা। মধ্যের এই ঘণ্টাগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে দেওয়া যায় না? যা হবার হয়ে যাক্—আর পারে না অতসী ভালমন্দ ভাবতে।

কর্ত্তব্যকে ভালবাসে ব'লে ও সেটা পালন করেনি। জীবনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে ও আগাগোড়া, নইলে এতদিনের এত সাধনার স্তম্ভ এমন ক'রে এক আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ত না।

তা' হোক—জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে ও পারবে না। আজ যাবেই ও, তারপর যা হবার হবে। আর অহঙ্কারের পেছনে নিজেকে

ছোটাবে না, হাল ছেড়ে দিয়েছে অতসী একেবারেই। মন যেখানে খুশী যাক্—

কিন্তু তবু, আজ সকাল ক'রে ফিরবে বাড়ীতে ও, আফিসে সে কথা ব'লে রাখা সত্ত্বেও, অতসী যথাসময়ে বাড়ী ফিরতে পারল না। তিনটের মধ্যে আফিস থেকে বেরুবার কথা। বাড়ী এসে প্রসাধন ক'রে বেরোবে কিন্তু তিনটের পরও বহুক্ষণ ও ব'সে রইল নিজের চেয়ারে।

'কৈ মিস্ সেন, উঠলেন না?' কে যেন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এই যে—' তবু ব'সেই থাকে আরও খানিকক্ষণ।

অবশেষে ওঠে, অবসন্ন ভাবে। ক্লান্তি, এ কী অকারণ ক্লান্তি ওর, অথচ কী সুগভীর! পা যেন ওঠে না, সারা দেহ পাথরের মত ভারি লাগে।

আফিস থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিই নিতে হয়। দেরি হ'য়ে গেছে, তা'ছাড়া এখন বাসে সেই ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করা—ভাবতেই পারে না অতসী।

বাড়ী এসে পৌঁছেও এ দ্বন্দ্ব ওর শেষ হয় না। শ্রান্তি ও অবসাদ কাটে না যেন কিছুতেই। নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে থাকে ও।

আর সময় নেই, এখনই উঠতে হবে—তা সে জানে। কিন্তু কী দুর্ব্বল লাগছে নিজেকে, কী একান্ত অবসন্ন। আচ্ছা, যেতেই কী হবে ওকে? পাগলের মত, শিশুর মত প্রশ্ন করে বারবার নিজেকেই।

ঘড়িতে কোথায় সাড়ে পাঁচটা বাজল। যদি যেতেই হয় ত এখনি উঠ্‌তে হবে—

অকস্মাৎ দম্‌কা হাওয়ার মত ঘরে এসে ঢোকে আল্‌পনা ও বিশু।

'এই যে, তুই এখানে দিদিভাই, কখন ফিরলি রে? আমরা ভেবে ভেবে হয়রান! আফিসে ফোন্ ক'রে লোক পাঠিয়ে সে এক কাণ্ড!'

আল্‌পনা এসে একেবারে জড়িয়ে ধরে ওকে। ওর আধশোয়া দেহের ওপর এলিয়ে পড়ে যেন।

আনন্দে, উত্তেজনায় ওর মুখ উদ্ভাসিত, আরক্ত। সেই সুন্দর মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে অতসী। ঠিক আধ-ফোটা ফুলের মত কোমল অথচ সতেজ আল্‌পনার মুখ, ঠোঁট দুটি যেন সত্যিকারের ফুলের পাপ্‌ড়ির মত, কৌতুকে কৌতূহলে ঈষৎ উন্মুক্ত হয়ে প্রভাতের প্রথম প্রহরের পদ্মর মত দেখাচ্ছে! প্রসাধন করেনি ব'লে ওর রূপটা আজ ঠিক ফুলের মতই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ লাগল অতসীর।

'তুই এমন শুয়ে আছিস্ কেন রে, অসুখ ক'রেছে নাকি? মাথা ধরেছে?'

সস্নেহে ওকে বুকে চেপে ধ'রে অতসী প্রশ্ন করে, 'তা তুই-ই বা অত হাঁপাচ্ছিস কেন? হয়েছে কি?'

ওর ললাটের কোলে কোলে স্বেদ-বিন্দু, ঠোঁটের ওপরে নাকের ওপরে অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর কয়েক ফোঁটা ঘাম।

'বা-রে! ছটা বাজে যে! দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

'কিসের দেরি?'

'আজ আমরা থিয়েটার দেখতে যাবো যে। বিশুকে জপিয়ে রাজী করিয়েছি, তিনটে টিকেট কেটে এনেছে ও। শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার। কখনও দেখিনি, কোথায় নিয়ে যাবে দিল্লী মিল্লী—একবার দেখে নিই—'

'টিকেট কাটা হয়ে গেছে একেবারে ?'

'ঐ ত।'

বিশুর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বিশুর হাতেই রয়েছে তিনটে টিকেট।

বিশু দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। দীর্ঘ ঋজু দেহ, একটু ঝুঁকে আছে ওরই বিছানার ওপর। মুখে তার কৌতুকের হাসি। নতুন-ওঠা শালগাছের মতই সরল ও সতেজ। কী সুন্দর দেখাচ্ছে বিশুকে।

আপুর মুখ ওর মুখের সামনেই বিকশিত হয়ে আছে যেন। নরম সুন্দর, সর্ব্বপ্রকার মালিন্য-লেশশূন্য সে মুখ।

যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সার দিয়ে ওর জীবন-লতায় এই দুটি ফুল সযত্নে ফুটিয়েছে ও—এরা সুখী হোক্, এরা সার্থক হোক্। সেই ওর জীবনের চরম সার্থকতা। এর কাছে নিজের সেই কাঙ্গালপনা, ছিঃ!

মনে করতেই যেন ঘৃণা হয় নিজের ওপর।......

আল্পনা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'কৈ—নাও তৈরী হয়ে, অমন ক'রে চেয়ে আছ কি ?'

'ওরে সে ত সাতটা, এখনও ঢের দেরী আছে। কিন্তু আমার যে বড্ড মাথা ধরেছে ভাই! সত্যি, বিশ্বাস কর্—আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। তোরা বরং দেখে আয়—'

ফুলের পাপড়ি যেন নিমেষে আউতে পড়ে। 'বারে—তিনখানা টিকেট কাটলুম, সবাই মিলে আনন্দ ক'রে যাবো!'

'আচ্ছা, তিনখানা টিকেটের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বিশু, তোরা অশোককে যাবার পথে তুলে নিয়ে যা, একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাস্ বরং—'

'অশোককে কোথায় পাবো এখন ?' বিশু অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে।

'ওমা—সে কি বিশ্রী, ছি!' আল্‌পনার সুন্দর মুখে কে একরাশ আবির ঢেলে দেয় যেন।

'হয়েছে, হয়েছে—অত লজ্জায় আর কাজ নেই।'

'কিন্তু তাকে এখন পাবো কোথায় ?' বিশু আবারও প্রশ্ন করে।

'সে আমি ব'লে দিচ্ছি।' একটু থেমে, অপ্রতিভের মত হেসে অতসী বললে, 'কাল তার সঙ্গে একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল জ্যোক্ করেছিলুম। তাকে বিশেষ দরকার আছে ব'লে গঙ্গার ধারে একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে ব'লে এসেছিলুম। আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কোন্ জায়গাটা। তাকেই নিয়ে যা, বেশ মজা হবে 'খন্। বলিস্ যে দিদি আসবে বলেছিল কিন্তু তার আসা হ'ল না। আসা সম্ভবও নয় তার। তাই আপুকে পাঠিয়ে দিয়েছে—না, বলিস্ বড্ড শরীর খারাপ তার। যা হয় বলিস্।'

অসংলগ্ন, দুর্ব্বলভাবে কথাগুলো বলে অতসী, কেমন যেন আল্‌গা ভাবে হাসে। পাগলের মত।

হাস্‌তে হাস্‌তেই বলে, 'একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয়—জায়গাটা বুঝিয়ে দিই।'